আমরা যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
এবং হিউম্যানিস্টস্
অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র
হেমন্ত সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৯

প্রধান সম্পাদক : সুমিত্রা পদ্মনাভন

সম্পাদক : মানসী, সন্তোষ, মৃণাল

দাম : পনেরো টাকা

উপদেষ্টা : প্রবীর ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস :
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কল-৭৪
ফোন : ২৫৫৯-০৪৩৫

হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন
পি ২, ব্লক বি, লেকটাউন কলকাতা-৮৯
ফোন : ২৫২১-৬২৭০

সূচি

সম্পাদকীয়/২

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি : প্রবীর ঘোষ/৩

আমাদের বোধহয় ভুল করার স্বাধীনতাও নেই : সমীর সাহা পোদ্দার/৫

মাননীয় মুখ্যসচিবের কাছে খোলা চিঠি : শুভেন্দু দাশগুপ্ত/৮

বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা নয় : রাণা হাজরা/১২

সচেতনতা : মৃণাল কয়াল/১৫

বেলুড় মঠের অন্দরে : প্রবুদ্ধ বাগচী/২০

আমাদের ধর্মচিন্তা : স্বপ্নময় চক্রবর্তী/২৫

নারী নিগ্রহের নানারকম : কৃষ্ণা বসু/৩৬

বুড়ো হওয়া : সুমিত্রা পদ্মনাভন/৪১

ভারতের প্রকৃত অবস্থান : জয়ব্রত ও অনিমা/৫২

মানবোন্নয়ন সূচক : সুমন দাঁ/৫৮

পশ্চাতে রেখেছ যারে... : জয়ব্রত পন্ডা/৬১

সোয়াইন ফ্লু : অভিজিৎ সাধুখাঁ/৬৩

সম্পাদকীয়

সবচেয়ে মজা হয় কুচক্রী যখন নিজের কুযুক্তির জালে জড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতাসীনদের কাজই যুক্তি-কুযুক্তি-অপযুক্তির জাল বিস্তার করা নিজের অবস্থান ঠিক রাখতে। এরা তো আর সাধারণ চোর-ছ্যাঁচোড় নয় যে অপমানিত ক্ষোভে বুক ফুলিয়ে বলবে—'বেশ করেছি চুরি করে খেয়েছি, খিদে পেয়েছিল তাই খেয়েছি'। এরকম একটা রোগা লোক বিয়েবাড়ির বুফেতে একা একা খেতে খেতে শেষে ধরা পড়ে খুব ঝাড় খেয়েছিল। তার উত্তর ঐরকম ছিল। খেতে খেতেই উত্তর দিয়েছিল 'কত করে প্লেট আপনাদের? ঠিক আছে, পরে দিয়ে দেব।' অনেকেই হেসে ফেলেছিল। কনের বাবা বলেছিলেন, ঠিক আছে বাইরে বসে খাওয়া শেষ কর, তারপর চলে যাও। পরে শুনেছিলাম, প্রচুর খাবার বেশি হয়েছিল। সে যাই হোক।

হোমড়া চোমড়া, আমলা-পুলিশ প্রশাসন, পুরনো কালের অফিস বস, জমিদার, জ্যাঠামশাই-দাদু টাইপের কর্তামশাইদের কখনও ভুল করতে নেই, অন্যায় করে ধরা পড়তে নেই, বোকা বনতে নেই।

বোকা বনেও তাই নানা যুক্তি দিয়ে বলার চেষ্টা করেন মন্ত্রীরা—না, আমরা হার মানিনি, বোকা হয়ে যাইনি, মোটেই মাথা নত করিনি। আরে ওরা তো মাওবাদীই ছিল না। এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হত। মাওবাদী হলে কি আর ছাড়তাম? কক্ষনো না।

একজন শিশুও শুনে হাসবে। আনপড় মানুষও কথাটা শুনেই বলছে—'তাহলে আগে ছাড়লে না কেন? শুধু শুধু দুটো লোক মরল, একজন কিডন্যাপ হল, এত নাটকের দরকারই হত না।'

যাকগে, আমরা ঐসব রাশভারী মন্ত্রী আমলা পুলিশদের ক্ষমা করে দিলাম। হাজার হোক 'হোমড়া' ভাবটা রাখতেই হয়, নয়ত লোকে মানবে কেন? থাকুন ওঁরা ওঁদের মুর্খের স্বর্গে। আর ওদিকে 'সত্যি মাওবাদী'দের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পদ্মামণি, শুভারাণী, সুমি, প্রতিমাদের মন ভরে উঠুক।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৫ অক্টোবর, ২০০৯
শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
পশ্চিমবঙ্গ

আপনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী। আপনার কাছে পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং ভারতের একজন নাগরিক হিসেবে কয়েকটি তথ্য জানতে চাইছি। আশা করি তথ্য জানার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে অনুসন্ধান করে উত্তরগুলো জানাবেন।

(১) ছত্রধর মাহাতো কোটি টাকার ইন্সিওরেন্স কোন কোম্পানি থেকে করিয়েছেন? (২) কবে করিয়েছেন? (৩) এ পর্যন্ত কটা প্রিমিয়াম দিয়েছেন? (৪) প্রিমিয়াম চেকে, না নগদ টাকায় দিয়েছেন? (৫) ছত্রধরের ইন্সিওরেন্স পলিসিটির 'নমিনি' কে? (৬) ওই ইন্সিওরেন্স কোম্পানি কী কী তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বুঝল যে ছত্রধর মাহাতোর কোটি টাকার ইন্সিওরেন্স করার মত আর্থিক সঙ্গতি আছে? (৭) 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি' কি 'সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট' অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত একটি সংস্থা? (৮) রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থা হলে সেই সংস্থা আইনত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতেই পারে, তাই নয় কি? (৯) ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স কোটি টাকা ছাড়ালেই বা বে-আইনি হবে কেন? (১০) 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি' রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থা না হলে আইনত কোনও ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলাই অসম্ভব। সংস্থাটি কি বে-আইনি ভাবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছে? কোন ব্যাঙ্কের কোন শাখায় খুলেছে? (১১) কোনও সংস্থার অ্যাকাউন্টে যে কেউ টাকা জমা দিতেই পারেন। তিনি সংস্থার একজন না হয়েও পারেন। তবে নগদে জমা পঞ্চাশ হাজার বা তার বেশি হলে অনেক প্রশ্ন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ করেন। কোনও স্বার্থান্বেষী মহল যে সংস্থার সুনাম নষ্ট করতে টাকা জমা দেননি, ছত্রধররাই টাকা জমা দিয়েছেন, তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে কি? (১২) ময়ূরভঞ্জে ছত্রধর সম্পত্তি কিনেছেন বলে প্রশাসন এমন ভাবে প্রচারে নেমেছেন, যেন বিশাল বে-আইনি কাজ করে ধরা পড়ে গেছেন। ময়ূরভঞ্জে ছত্রধর কবে সম্পত্তি কিনেছেন? 'পুলিশী সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটি' গড়ে ওঠার আগে, না পরে? সম্পত্তির মূল্য কত কোটি, কত লাখ বা কত হাজার? এই সম্পত্তি

কি হিসাববহির্ভূত আয়ের প্রমাণ? (১৩) বে-আইনি নয় এমন সংস্থাকে অর্থ-সাহায্য করা কোন আইনে অপরাধ? চাঁদা বা ডোনেশন তোলাই বা কোন আইনে অপরাধ? (১৪) রাজ্য পুলিশের ডি জি ভূপিন্দর সিং এবং রাজ্যের মুখ্যসচিব অশোকমোহন চক্রবর্তী ঘোষণা করেছেন—ছত্রধর মাহাতোদের সঙ্গে যাঁরা যোগাযোগ রাখতেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে 'আনলফুল অ্যাকটিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট' অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বে-আইনি নয় এমন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা বে-আইনি হতে পারে না। সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করে, ব্ল্যাকমেল করে ছত্রধরদের পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশ থেকে বুদ্ধিজীবীদের সরাতে ডি জি ও মুখ্যসচিব স্পষ্টতই আইন ভেঙেছেন। ওঁদের বে-আইনি কাজের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন? (১৫) এই রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে আপনার নিশ্চয়ই অজানা নেই যে রাষ্ট্রসংঙ্ঘের গাইডলাইন সম্পূর্ণ অমান্য করে 'আনলফুল অ্যাকটিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট' তৈরি হয়েছে। তারপরও কোন যুক্তিতে এমন 'বে-আইনি' আইনের বিরোধীতা না করে প্রয়োগ করছেন?

নমস্কারান্তে

প্রবীর ঘোষ

সাধারণ সম্পাদক

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

(এই চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছে 'একদিন' সংবাদপত্রে ৭ অক্টোবর ২০০৯ এবং 'সংবাদ' পত্রিকায় ১২ অক্টোবর ২০০৯।)

উত্তর দিলেন ডিজি

৯ অক্টোবর সাংবাদিক সম্মেলনে ডিজি ভূপিন্দর সিং জানান, ছত্রধর মাহাতো কোটি টাকার ইন্সিওরেন্স করেছেন, এমন কোনও তথ্য তাঁর কাছে নেই। কোনও ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে ইন্সিওরেন্স করিয়েছেন, এমন তথ্যও তাঁর কাছে নেই। জনসাধারণের কমিটির (PCAPA) কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে কিনা, এ বিষয়ে তাঁদের কাছে এখনও কোনও তথ্য নেই।

৩ অক্টোবর রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে মিডিয়াকে খবরটা খাওয়ানো হয়েছিল।

মিথ্যে প্রচারের বেলুন চুপসে দিতে পেরে আমরা গর্বিত।

ফি চা র

আমাদের বোধহয় ভুল করার স্বাধীনতাটুকুও নেই

সমীর সাহা পোদ্দার

আজ থেকে প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে এপারে চলে এসেছিলেন একদল মানুষ। এপারে এসে উত্তর চব্বিশ পরগণার রাজারহাটে থাকতে শুরু করেন। ওদেরই এক বাসিন্দার কথায়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দয়ায় মাথা গোঁজার ঠাঁই আর ভোটাধিকার মেলে। কারও না কারও দয়াতে এঁরা আজও বেঁচে থাকেন, ভোট দেওয়ার অধিকার পান। এভাবেই থাকতে হয়। এই বোধ মানুষগুলোর মস্তিষ্কের জমি অধিগ্রহণ করে আছে। তাই বোধহয় এঁরা কলোনির নাম দেন জ্যোতি নগর। এঁরা বলতে পারেন না—দেশভাগ আমরা মানি না, ওপারৰএপার যেখানে খুশি থাকার অধিকার আমাদের আছে। এতদিন ধরে এরা এপারে থেকে গেলেও নাগরিক পরিষেবা তেমন কিছু জোটেনি।

যারা দেশটাকে ভাগ করেছিল, সেই ব্রিটিশের একটি সরকারি সংস্থা ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) ২০০৭ সালে জ্যোতি নগরের উন্নয়ন চেয়ে ৪২০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। এই টাকা থেকে কলোনির ৬০০ পরিবারের জন্য হয়েছে শৌচাগার, পাকা রাস্তা, কলোনির ভেতরে বাঁধানো গলিপথ। বসেছে পানীয় জল ও নিকাশির পাইপলাইন। কাজ শেষ হওয়ার পর পরিদর্শনে এসেছিলেন দুই ব্রিটিশ মন্ত্রী ডগলাস আলেকজান্ডার, এড মিলিব্যান্ড। কাজ দেখে তাঁরা খুশি হন। জানিয়েছিলেন, এ বছরও অনুদান বজায় থাকবে। কলোনির ৭০ ছুঁই ছুঁই এক বৃদ্ধা ব্রিটিশ সাহেবদের দেখে বললেন, 'ভাষা জানি না। তাই মনে মনেই ওঁদের ধন্যবাদ জানালাম।' ফলাও করে কাগজে ব্রিটিশ মন্ত্রীদের ছবি ছাপানো, টিভি কভারেজ হল। হই হই কান্ড রই রই ব্যাপার। উন্নয়ন দ্রুতলয়ে এগিয়ে চলছে।

জ্যোতি কলোনির বাসিন্দাদের নিশ্চয়ই সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে, কারণ তাঁরা ট্যাকস দেন। আরও অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। এতদিন দেরি হলেও তাঁরা যে পেলেন, নিশ্চয়ই এটা উন্নয়নের লক্ষণ। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা এটাও শিখলেন, যে জাতটা দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের পদানত করে রেখেছিল, আজও সেই জাতটার যদি ইচ্ছে হয়, তা হলেই তাঁরা একটু উন্নত জীবনযাত্রার ছোঁয়া পেতে পারেন। তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য তাদের

নিজস্ব পরিকল্পনা বা চার হাত পা দিয়ে স্বাধীনভাবে কিছু করার সুযোগ নেই। তাই আজকের উন্নয়ন কি আবালবৃদ্ধবনিতার এই বৌদ্ধিক পঙ্গু ঘোচাতে পারে? আত্মনির্ভরশীলতা ছাড়া কি এই পঙ্গু কাটানো সম্ভব? আজ সরকারি উন্নয়ন মানেই বিদেশি অনুমোদিত প্রকল্পে বৈদেশিক অনুদানপুষ্ট কর্মকাণ্ড। যে উন্নয়নের সঙ্গে বৌদ্ধিক জড়ত্ব মাখামাখি করে থাকে, তাকেই 'প্রকৃত উন্নয়ন' বলে মানতে শিখিয়ে আসছে আমাদের সমাজ, বিগত অনেকগুলো বছর ধরেই।

২০০৫-০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খড়গপুর আইআইটি-র বিশেষজ্ঞদের দিয়ে জঙ্গলমহলের ৭৪টি ব্লকে অনুসন্ধান চালায়। সেই রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১ কোটি ৩০ লক্ষ আদিবাসীর ৬৯ শতাংশই বাস করেন দারিদ্রসীমার নীচে। ৮৫ শতাংশ গ্রাম বিদ্যুৎহীন। চাহিদার তুলনায় সরকারি পানীয় জল সরবরাহের হার মাত্র ৯ শতাংশ। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে গড়ে কাজ পান ও ৬ থেকে ৭ দিন। ৫৯ শতাংশ মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকেই বঞ্চিত। সরকারি স্বাস্থ্য পরিবেষবার হাল আরও ভয়াবহ। ১৩০০০ মানুষ প্রতি ১ জন সরকারি ডাক্তার। এর ওপর আছে পুলিশ ও হার্মাদবাহিনীর যৌথ আক্রমণ। পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে জঙ্গলমহলের মানুষ মাত্র ১১ মাস আগে একটি জনগণের কমিটি গড়ে তোলেন। ইতিমধ্যে কমিটি ওই এলাকায় কিছু উন্নয়নমূলক কাজেও হাত দিয়েছে। ধরমপুর অঞ্চলে কমিটি ২০ কিলোমিটার মোরামের রাস্তা তৈরি করেছে মাত্র ৪৭ হাজার টাকায়। এই একই দৈর্ঘের রাস্তা তৈরির জন্য পঞ্চায়েতের খরচ হয় তিন লক্ষ টাকা। ফলে অনুজ পাণ্ডের মতো নেতাদের আয়ের উৎস সহজেই অনুমেয়। এছাড়াও কমিটি কিছু টিউবওয়েল বসিয়েছে, একটা পুলিশ ক্যাম্প হটিয়ে সেখানে হাসপাতাল চালু করেছে। যদিও যৌথবাহিনীর সঙ্গে এলাকা দখলের টানাপোড়েনে সেই হাসপাতালের কাজ ব্যাহত হয়েছে অনেক সময়ই। জনগণের কমিটির প্রভাব জঙ্গলমহলে ২১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার ১৩০০ গ্রামে। এগারো মাসে তারা উন্নয়নের কাজ যেটুকু করেছেন, চাহিদার তুলনায় তা হয়তো অতি নগণ্য। কিন্তু তারা নিজেদের উদ্যোগে, নিজেরা অর্থসংগ্রহ করে, নিজেদের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কাজটা শুরু করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বনির্ভরতার দর্শন। আর কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা নয়। তাঁরা জানিয়েছেন, কোনও সরকারি সাহায্য তাঁদের দরকার নেই। তাঁদের এলাকার জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার তাঁদের। উন্নয়ন কোথায়, কী ভাবে হবে তাঁরাই বুঝে নেবেন। তাঁদের স্পষ্ট কথা—'জঙ্গলমহল এলাকায় স্বাধীন কর্তৃত্ব আমাদের চাই। যৌথবাহিনী এখান থেকে সরে যাক'।

যাঁরা স্বাধীনভাবে ছোট্ট একটা জায়গায় প্রকৃত উন্নয়নের সামাজিক কর্মকাণ্ড ঘটাতে চান, সেখানেই সরকার যৌথবাহিনী পাঠিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে, বহুদিন

ধরে জারি রেখেছে ১৪৪ ধারা, যাতে বাইরের লোক ওখানকার নাড়ি-স্পন্দন বুঝতে না-পারে। ছত্রধর মাহাতোর সাম্প্রতিক গ্রেফতারির কথা ছেড়ে দিলেও অত্যাচারের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া পুরুষহীন গ্রামে যৌথবাহিনীর অত্যাচার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

১৮৩৫-এর ২ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মেকলে সাহেব বলেন, 'আমি ভারতের সর্বত্র ঘুরেছি, কোথাও কোনও ভিক্ষুক কিংবা চোর দেখিনি। উচ্চনৈতিকতা ও গুণসম্পন্ন মানুষ আমি দেখেছি, যা দেশটির অমূল্য সম্পদ। তাই আমার মনে হয় আমরা কোনওদিন দেশটাকে জয় করতে পারব না যতদিন না মানুষগুলোর মেরুদন্ড ভেঙে দিতে পারছি। আধ্যাত্মিক আর সাংস্কৃতিক পরম্পরা হল সেই মেরুদন্ড। দেশটার প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিকে, সংস্কৃতিকে পালটে দেওয়া দরকার। কারণ ভারতীয়রা যদি ভাবতে শুরু করে যে, যা কিছু বিদেশি ও ইংরেজদের কাছ থেকে পাওয়া, সবই উৎকৃষ্ট, তাহলে তারা নিজেদের সংস্কৃতি, আত্মমর্যাদাবোধ হারাবে। তখনই আমরা তাদের যেমনভাবে পেতে চাই ঠিক তেমনভাবে পাব—, একটি সত্যিকারের দমিত জাতি।

মুখ ফেরালে রবীন্দ্রনাথকে পাই। উনি বলেছেন—'আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয়, স্বাধীন কর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিঁখুত নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয়, তবে তার চেয়ে না হয় ভুলই করিলাম।... আজকের দিনে একথায় কারো মনে সন্দেহের লেশমাত্র নাই যে, আত্মকর্তৃত্বের চির সচলতার বেগেই মানুষ ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অন্যায়ের গর্তে ঘাড়-মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে পিছমোড়া বাঁধিয়া তার মুখে পায়সান্ন তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো'।

৬২ বছরে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার হাল আইআইটি-র রিপোর্টে দেখা গেছে। কিন্তু জঙ্গলমহলের জীবন থেকে পাওয়া শিক্ষা তাদের রবীন্দ্রচেতনায় পৌঁছে দিয়েছে।

লেখক পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এবং মানবাধিকার কর্মী

'একদিন'—০৮.১০.২০০৯

মাননীয় মুখ্যসচিবের কাছে খোলা চিঠি

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

সাম্প্রতিক কালে আপনার একটি মন্তব্যে আমার পরিচিতজনেরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আপনি নাকি বলেছেন যে সব বুদ্ধিজীবীরা মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, তাঁদের ধরা হবে।

আপনি আমায় বুদ্ধিজীবী ধরতে পারেন। পেশায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। একটু-আধটু লিখি এখানে সেখানে সংবাদপত্রেও। একবার দু'বার বলি রেডিওতে, টেলিভিশনে, হেথায়-যেথায়-সভায়। 'বুদ্ধিজীবী' মানতে পারেন।

আর বুদ্ধিজীবীদের যা কাজ হওয়ার কথা, আমাদের দেশে, পৃথিবীর নানা দেশে, যা এতদিন হয়ে এসেছে। ক্ষমতার সমালোচনা করা, বিরোধিতা করা, বিরুদ্ধতায় দাঁড়িয়ে পড়া। আমি ধরুন তাতেও খানিকটা রয়ে গেছি। সেই ক্ষমতায় অনেকের মধ্যে থাকে দল, পুঁজিমালিক, সশস্ত্রবাহিনী—এইরকম সব। এটা কোনও অপরাধ নয়। গণতন্ত্রে এমনই হবার কথা। আর আমাদের দেশটা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, একটি গণতান্ত্রিক দেশ। আর আপনি যে দলের সরকারের মুখ্যসচিব, সেই দলের আপনি একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে মতাদর্শে বিশ্বাস করার কথা সেই মতাদর্শ যাদের মতভিত্তিক তাদের লেখাতে আছে। বুদ্ধিজীবীদের কাজ ক্ষমতার সমালোচনা করা, বিরোধিতা করা। তো ধরুন আমি, আমার মতো বুদ্ধিজীবীরা সেই কাজেই আছেন।

'বুদ্ধিজীবী' ব্যাপারটা আপনার কাছে খানিকটা খোলসা করে এবার 'মাওবাদী' বিষয়টাতে আসি। 'মাওবাদ' মানে মাও সে-তুঙের চিন্তাধারার প্রত্যয়। আপনি যে দলের মুখ্যসচিব সেই দলের বড় কোনও অফিসে গেলে দেখবেন, অন্তত আগে দেখা যেত, মাও—এর ছবি দেওয়ালে টাঙানো। এই ক'দিন আগে, কাগজে পড়লাম, সেই দল, সিপিএম, চিন বিপ্লবের ৬০ বছর পালন করল। যে বিপ্লবের অন্যতম কর্মী মাও। এবং আপনি হয়ত জানেন না, আপনাকে জানিয়ে দিই, এই চিন বিপ্লব কিন্তু সশস্ত্র ছিল। আর দেখুন, যে দলের হয়ে আপনি কথাবার্তা বলছেন, তাদের একসময়ের লেখা উত্তরে মাও-এর রচনা থেকে উদ্ধৃতি থাকত। এবং, এটা নিশ্চয়ই আপনার জানা থাকবে না, মাও-এর রাজনীতিক মতাদর্শে হিংসার একটা

জায়গা রয়েছে।

তো ধরুন এইসব শুনেটুনে কেউ যদি বলে আপনার সরকারের দল মাওবাদী, আপনার পক্ষে চটকরে কিছু বলা একটু মুশকিল হবে। এখন এমন যদি হয় সিপিএম-এ বুদ্ধিজীবী থাকেন, নিশ্চয়ই আছেন, তিনি যদি চিন বিপ্লবের ষাট বছর নিয়ে লিখতে গিয়ে, নিশ্চয়ই লিখবেন, মাও সে-তুং নিয়ে লিখে ফেলেন, লেখারই কথা, তাহলে তিনি তো হলেন, 'মাওবাদী বুদ্ধিজীবী'। হলেন কি? হলে আপনার সমস্যা। অতএব ধরে নিচ্ছি হলেন না।

এবার সরকারে থাকা দল থেকে সরকারে থাকা দলের নিয়ন্ত্রণে থাকা অধম আমার কথায় আসি।

আমার প্রিয় শিক্ষকদের মধ্যে মাও সে-তুঙ একজন। '৭০ দশকের ছাত্র অবস্থায় অনেকের মতো, আমরাও মাও সে-তুঙ নিয়ে একটু আধটু পড়াশোনা করেছি। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাও সে-তুঙের নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে, অনেকের মতো, আমিও ঠিক বলে মনে করি। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থা নিয়ে মাও সে-তুঙের নানা মতকে অনেকের মতো, আমি বিকল্প ধারণা হিসাবে গ্রহণযোগ্য মনে করি।

আমার বিভিন্ন লেখায়, এমন কী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ক্লাসে আমি মাও সে-তুঙের মত ব্যক্ত করেছি, ব্যাখ্যা করেছি। ধরুন সে হিসাবে আমি মাওবাদী, একজন 'বুদ্ধিজীবী মাওবাদী'। তো এটা কেন একটা অপরাধ হবে? এবং আপনি আমায় কেন ধরবেন? বা আমার মতো যারা তাদের ধরবেন?

আপনি নিশ্চয়ই আমার যুক্তি থেকে বেরোতে চাইবেন। বলবেন মাওবাদী বুদ্ধিজীবীদের নয়, যে সব বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মাওবাদীদের যোগাযোগ আছে তাদের ধরবেন।

কোনওরকমে 'বুদ্ধিজীবী' আর 'মাওবাদী' বোঝালাম আপনাকে। বুঝলেন হয়তো। কিন্তু এই 'যোগাযোগ' কথাটা বেশ গোলমেলে। দেখি আপনাকে বোঝাতে পারি কি না। ধরুন আমি এবং আমার মতো অনেক বুদ্ধিজীবী নানা ধরনের কাজে জড়িয়ে থাকি। আমরা বলি বিকল্প গণ উদ্যোগ। বিকল্প কার? সরকারের। সরকারে থাকা দলের, দলদের উদ্যোগের বিকল্প। কেন বিকল্প? এ প্রশ্নের উত্তর এই চিঠিতে রাখছি না।

এই বিকল্প গণউদ্যোগে থাকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলসঞ্চয়, কৃষি, বীজ সংগ্রহ, পরিবেশ রক্ষা, জলাভূমি সংরক্ষণ। থাকে খাদ্যসার্বভৌমত্ব, অরণ্যসম্পদ, জীববৈচিত্র, নাগরিক অধিকার, নদীসংস্কার, আদিবাসী জীবনযাপন—এমন সব বিষয়। এসব নিশ্চয়ই 'অপরাধী' বিষয় নয়। এমন ধরনের কাজে যুক্ত থাকে বিভিন্ন সংগঠন, জনগোষ্ঠী, ব্যক্তি, স্থানীয়, বহিরাগত।

এবার ধরুন আমরা বুদ্ধিজীবীরা সরকারের আদিবাসীদের নিয়ে যে সব প্রকল্প আছে, তাতে যে টাকা আসছে, সেই সেই টাকা সেই সেই কাজে যারা ঠিকঠাক লাগাচ্ছে না, তাদের ধরা হবে। যেমন ধরুন, আপনি হুমকি দিতে পারতেন, যারা যারা আদিবাসীদের জমি নানাভাবে ঠকিয়ে নিয়েনয় (সত্যি বলছি নেয়। আপনি এ রাজ্যে এক সময়ে যিনি ভূমিরাজস্ব সচিব ছিলেন, সেই পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটা পড়ে নেবেন, তাতে লেখা আছে) তাদের ধরা হবে।

আপনি হুমকি দিতে পারতেন, উত্তরবঙ্গে বনবস্তিতে থাকা নিরীহ আদিবাসী বা বনবাসীদের ওপর যারা অত্যাচার করে (সত্যি বলছি করে, বিচারপতি সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের প্রতিবেদনে আছে। আপনি চাইলে দিতে পারি) তাদের ধরা হবে। তো, এমন হুমকি আপনি দেননি। সে আপনার ইচ্ছে। আপনার ইচ্ছে হুমকি দেওয়া। বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মাওবাদীদের যোগাযোগ থাকলে ধরবেন। এই জায়গাটায় এসে আপনার আর আমার চটে যাওয়া পরিচিতজনদের একটা কথা বলব। একটা বেশ জরুরি কথা। হুমকি দিয়ে কথা। আশির দশকের মাঝামাঝি আমাদের দেশে, যারা আমাদের টাকা ধার দেয় আইএমএফ তারা একটা নীতি মানতে বাধ্য করে। তার ইংরিজি নাম স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। বেশি কথায় যাচ্ছি না, অল্প কথায় বললে— সরকার অর্থনীতিতে যা যা করছে, সে সব আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেবে। আর সরকারি জায়গা সব বেসরকারি সংস্থাদের, মানে পুঁজি-মালিকদের দিয়ে দেবে। সরকার মেনে নিয়েছে।

এরপর নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি এল বিশ্ববাণিজ্য নীতি। সবাই একে চেনে 'ডব্লিউটিও' নামে। এটা বিরাট বড় ব্যাপার। ছোট করে বলছি। অর্থনীতির কাজকম্ম থেকে সরকার সরে যাও, বেসরকারি কাজকম্মে সরকার নিয়ন্ত্রণ তুলে নাও। তো, সরকার মেনে নিয়েছে। তার ফলে, সব মিলিয়ে সরকারের আর অর্থনৈতিক কাজকম্ম থাকছে না। সরকারের থাকছে শুধু প্রশাসনিক কাজকম্ম মানে আপনারা, নিরাপত্তা উপদেষ্টা, মুখ্যসচিব, প্রশাসন। আর প্রশাসনের প্রধান কাজই নাগরিকদের হুমকি দেওয়া। এতে চটার কি আছে। নইলে ভাবুন, মুখ্যসচিব, নিরাপত্তা উপদেষ্টা, এ সব পদ তো জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয়, অথচ এরাই জনগণকে বলে দিচ্ছে কী করা উচিত, কী উচিত নয়। এখন তো তাই-ই হওয়ার কথা। এতে চটার কি আছে? সত্যি পারেও বুদ্ধিজীবীরা।

আপনি ওদের কথায় কান দেবেন না, বরং টেনে ফেলুন। এবার শেষ করি, অনেক হল। শেষ কথাটায় আসি। শেষ যে ঘটনা দিয়ে আপনার হুমকি। লালগড় নিয়ে। আদিবাসী আন্দোলন নিয়ে। এই বিষয়ের সঙ্গে আগের বিষয়টা জুড়ে দিয়ে বলি।

এই যে ভারতের অর্থনীতি পুঁজিমালিকদের কাছে কাছা খুলে দিয়ে দেওয়া

হচ্ছে, ওরা যেখানে পাচ্ছে, হাত ঢোকাচ্ছে। জমি জঙ্গল, উপকূল, নদী, পাহাড়। আর ঠিক এই এই জায়গাগুলিই আদিবাসীদের জীবন আর জীবিকার ভূমি, তাদের উচ্ছেদ, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। আর এদিকে সরকার, সরকারে থাকা দলেরা, শুধুই প্রশাসনিক। প্রশাসনিক সরকার প্রশাসনিক কারণে এই জন আন্দোলন ভাঙতে চাইবে।

এই জন আন্দোলনে যারা থাকছেন, যারা সমর্থন করবেন, তাদের হুমকি দেবেন। দেবেন-ই। এতে চটে যাবার কী আছে? বুদ্ধিজীবীরা পারেও বটে। আপনি ওদের চটে যাওয়ায় কান দেবেন না। বরং হুমকি দিন।

ভালো থাকবেন,

নমস্কারান্তে

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

গণউদ্যোগে জড়িয়ে থাকার বদঅভ্যেসের একজন বুদ্ধিজীবী।

চিঠিটি বেরিয়েছে ‘একদিন’ পত্রিকায় ১৩.১০.২০০৯

সাহসী সাংবাদিক

পয়লা সেপ্টেম্বর গ্লোবাল মিডিয়া ফোরামের রিপোটার্স উইদাউট বর্ডার এর আমেরিকা শাখার তরফ থেকে সৎ ও সাহসী সাংবাদিক হিসাবে পিটার ম্যাফলার পুরস্কার দেওয়া হল শ্রীলঙ্কার সাংবাদিক J.S. Tissainayagam-কে।

ঠিক তার আগের দিন ৩১ আগস্ট শ্রীলঙ্কার কলম্বো হাইকোর্ট Tissainayagam-কে ২০ বছর কারাদন্ডের নির্দেশ দিয়েছে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে। প্রসঙ্গত Tissainayagam দীর্ঘদিন ধরে তামিল জনজাতির ওপর শ্রীলঙ্কা সরকারের অত্যাচার ও অন্যায় এর কাহিনি একজন সৎ সাংবাদিক হিসাবে তুলে ধরছিলেন দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে।

প্র ব ন্ধ

বিরোধীতার জন্য ‘বিরোধীতা’ নয়

রাণা হাজরা

১৮৫৯ সালে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি পড়ে জেনেছিলাম নীলকর সাহেবদের অসহনীয় অত্যাচারের কথা। ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ থেকেও জানতে পারি বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে উর্বর জমিতে নীলকর সাহেব ও তাদের নায়েব গোমস্তাদের নির্মম শোষণ। এরা কোন ব্যবসায়ী ছিল না। নীল ব্যবসায় উৎপাদক ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে ‘মধ্যস্বত্ত্বভোগী’। সহজ বাংলায় দালাল বা ফোড়ে।

কলকাতায় ‘বাবু’ সম্প্রদায়ের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন ‘দালাল’ গোছের লোকজন। ফিরিঙ্গি বণিক এবং বাংলা-বিহারের ক্ষুদ্র উৎপাদক শ্রেণির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কাজ করতেন। কৃষি বা কুটির শিল্পের সাথে যুক্ত লোকজনের থেকে খুব কম দামে উৎপাদিত দ্রব্য কিনতেন। পরে বেশি দামে ফিরিঙ্গি বণিক সম্প্রদায়ের কাছে বিক্রি করতেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই ‘চুক্তি চাষ’ পদ্ধতিতে গরিব চাষীদের নিজস্ব জমি কাজে লাগাতেন। কুটির শিল্পে যুক্ত গরিব মানুষদের সাথেও চুক্তি পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। চুক্তি পদ্ধতির নামে এরা গরিব মানুষদের উপর যথেচ্ছভাবে শোষণের স্টীম রোলার চালাতেন। মধ্যস্বত্ত্বভোগীরা আর্থিকভাবে যথেষ্ট ফুলে ফেঁপে উঠেছিলেন। ইতিহাস থেকে জানতে পারি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ জগন্নাথ কুশারীও একজন মধ্যস্বত্ত্বভোগী ছিলেন।

বর্তমানেও এই দালাল সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। আলু, ধান জাতীয় কৃষিপণ্যে উৎপাদক ও ব্যবহারকারীর মধ্যে বিভিন্ন ধাপে এরা থাকে। এরা যদি উৎপাদকদের থেকে এক টাকায় জিনিস কেনে, এই দালালদের দৌলতে ব্যবহারকারী দশ থেকে বিশ গুণ বেশি দামে কিনতে বাধ্য হয়।

দালালদের ক্ষমতা বোঝাতে মাত্র দুটি উদাহরণই যথেষ্ট। গত বছর আলু উৎপাদনের সময় এই দালাল বা ফোড়েরা চাষিদের থেকে সাধারণভাবে দুই বা তিন টাকা দরে কিনেছিল। (অসমর্থিত সূত্র অনুযায়ী) বিভিন্ন দালালদের হাত ঘুরে আলুর প্যাকেটগুলো হিমঘরে পৌঁছায়। পরে হিমঘর থেকে সাধারণ ক্রেতার কাছে। সেই আলু আমরা এখন কিনছি কুড়ি থেকে তেইশ টাকা দরে। আলু চাষিদের দুর্দশা সম্বন্ধে মিডিয়ার কল্যাণে আমরা সবাই অবগত। আলুর জন্য আমাদের ট্যাঁকে

কিভাবে টান পড়ে, তা বলে আপনাদের যন্ত্রণা বাড়াতে চাই না। ভাবলে আশ্চর্য হবেন, যে দোকান থেকে আমরা আলু কিনি, তারাও প্রতি কিলোতে সাধারণত দু' টাকার মত লাভ করে নেয়।

এবার আসি, বাংলার এক অতি প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ কুটির শিল্পের কথায়। বাংলার তাঁত শিল্প। আপনি একটি খুব সাধারণ হাতে বোনা তাঁতের শাড়িও কেনেন তিনশ টাকার মত দাম দিয়ে। তিনশ টাকার শাড়ি বুনতে কাঁচামাল লাগে একশ টাকার মত। তাঁত বোনার কাজে যুক্ত মানুষটি পান ষাট টাকা। একটি শাড়ি বুনতে তার সময় লাগে তিনদিন। তাঁতের একটি শাড়ি বুনতে সাধারণত খরচ হল একশ ষাট থেকে সত্তর টাকার মত। বাকি টাকাটা যায় দালালদের পকেটে।

এই দালাল বা ফোড়েদের বিরুদ্ধে কোন দল বা সংগঠনের সক্রিয় প্রচেষ্টা কোনদিন দেখা যায়নি। কিন্তু গোলযোগ বাধল তখনই, যখন কিছু বহুজাতিক সংস্থা মধ্যস্বত্ত্বভোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে শুরু করল। আমাদের দেশের বিভিন্ন দল এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব বিরোধী এবং বামফ্রন্টের শরিক দলের একাংশ রে রে করে তেড়ে উঠল। এইসব সংস্থায় বিভিন্ন বিপণন ক্ষেত্রগুলোতে বিক্ষোভ থেকে ভাঙচুর সব হল। বিরোধীতার কারণগুলো সঠিকভাবে কেউই জানতে পারল না। তৃণমূল থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক খুচরো ব্যবসায়ীদের স্বার্থহানির আশঙ্কায় সোচ্চার হল। উৎপাদক থেকে ক্রেতার মধ্যে যোগাযোগকারী যে মধ্যস্বত্ত্বভোগীরা বিভিন্ন ধাপে আছে, তাদের বিরুদ্ধে এদের কাউকে সোচ্চার হতে দেখা যায়নি। দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান এই মধ্যস্বত্ত্বভোগীরা উৎপাদককে চাপ দেওয়া থেকে শুরু করে, তাদের মা-বোনেদের সম্মান নিয়েও টানাটানি করে। তবুও এদের বিরুদ্ধে সংগঠিত এবং ব্যাপক কোন প্রতিবাদ দেখা যায় না। বহুজাতিক সংস্থাগুলো এই ভূমিকায় নামলে দোষের কী? তারা তো কারো মা-বোনের সম্মান নিয়ে খেলা করে না।

বহুজাতিক সংস্থাগুলো ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে কৃষকের থেকে উৎপাদিত দ্রব্য কিনে, সরাসরি ক্রেতাকে বিক্রী করলে অসুবিধাটা কোথায়? এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধাপে থাকা দালালদেরও অবলুপ্তি ঘটবে। কৃষকেরাও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আধুনিক উপায়ে উৎপাদন করতে পারবে। কৃষকেরা ব্যবসায়ী হলে সেটা তো সমাজ ও দেশের পক্ষে মঙ্গল। একসাথে অনেকগুলো সংস্থা বিপণন ব্যবসায়ে নেমে পড়েছে। ফলে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে যে প্রতিযোগিতার আবহ তৈরি হবে তাতে তো কৃষক ও সাধারণ ক্রেতার লাভবান হওয়ার কথা।

টেলিকম ব্যবসা সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকার সময় সরকারি ও বেসরকারি অফিস এবং ধনী ব্যক্তিদের সুদৃশ্য কাঠের টেবিলে দূরভাষ যন্ত্রটি শোভা পেত। ১৯৯১-এ উদারীকরণ নীতির ফলে বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী বহুজাতিক সংস্থা টেলিকম ব্যবসায় নেমে পড়ল। টেলিকম ব্যবসায় যে প্রতিযোগিতায় আবহ তৈরি হল তার ফলে

উপকৃত হল ক্রেতা সাধারণ। রেলের কুলি থেকে জমাদার, রিক্সাওয়ালা সবার হাতে সুদৃশ্য মোবাইল। ভারতের সমাজজীবনে এক বড় বিপ্লব সাধন করে চলেছে মোবাইল যন্ত্রটি। বহুজাতিক সংস্থাগুলোর উপর সবচেয়ে বেশি খড়্গাহস্ত মাওবাদীদেরও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম এই যন্ত্রটি।

ভারতবর্ষের প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষ কৃষিজীবি। সমাজে কৃষককূলের উদ্ভব থেকে আজ পর্যন্ত এই গোষ্ঠী কখনো সুখের মুখ দেখেনি। যারা মানুষের মুখে খাবার তুলে দেয় তাদের দুর্দশা সবচেয়ে বেশি। সর্বস্থানে, সর্বকালে তাদের অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। বর্তমান সামাজিক পরিকাঠামোয় তাদের অবস্থার উন্নতিসাধনে সঠিক দিশা কেউই দেখাতে পারেনি (যারা বহুজাতিক বিপণনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন)। কৃষকদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির পথ না দেখিয়ে, 'চলছে না, চলবে না' রাজনীতি করতে তারা বড্ড বেশি ব্যস্ত। খুচরো ব্যবসায় যুক্ত মানুষদের থেকে কৃষকেরা সংখ্যায় বহুগুণ বেশি। কিছু মানুষের সামান্য ক্ষতিসাধন হয়ে সমাজের বৃহৎ অংশের মানুষ উপকৃত হলে ক্ষতিটা কোথায়?

আরো একটা জরুরি প্রশ্ন উঠে আসছে, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা কোন কারণে ফসল নষ্ট হলে দায়টা কৃষকের উপর বর্তাবে। এই কথা চিন্তা করে সরকার থেকে কৃষি বিমা যোজনা তৈরি হয়েছে। খুব সামান্য টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে কৃষকেরা এই সুবিধা নিতে পারে। আমাদের উচিত কৃষকদের কৃষি বিমা করানোর দিকে উৎসাহিত করা।

তাছাড়াও আমাদের আদ্যিকালের বাজারগুলোর যা অবস্থা। জল-কাদা-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের জিনিস কিনতে হয়। তার বদলে আমাদের মত সাধারণ ক্রেতারা যদি মনোরম পরিবেশে, বিজ্ঞানসম্মত এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্যাকেজিং করা বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পারি, তা তো খুশির কথা।

বিপণন ব্যবসায় বহুজাতিক সংস্থাগুলোর উপস্থিতি নিয়ে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেই পারি। যদি দেখি ক্ষতির পাল্লাটা বেশি অবশ্যই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। দরকারে বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে তাড়িয়েও দিতে পারি। সেই ক্ষমতা আমাদের আছে। অন্যায় দেখে সিঙ্গুর থেকে টাটাদের, নন্দীগ্রাম থেকে সালিমদের আমরা-ই তাড়িয়েছি। অন্যায় করলে বহুজাতিকদের আমরাও তাড়াতে পারব। শুধু দরকার জনগণের সচেতনতা ও একজোট থাকা।

বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করব ভাবলে তা কখনো সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর হতে পারে না। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির নাম শুনলেই হাত তুলে, গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করব, এটাও কাম্য নয়। ভালো-মন্দ সঠিকভাবে বুঝে বিরোধীতা সমাজের উন্নতিসাধনে সক্ষম। কোন বিষয় নিয়ে বিরোধীতা করার আগে অবশ্যই সেই সম্বন্ধে সঠিক দিশা দেখানো উচিত। গঠনমূলক বিরোধীতাই সমাজকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে।

প্র ব ন্ধ

সচেতনতা

মৃণাল কয়াল

'সচেতনতা' শব্দটি যেহেতু সচেতন শব্দের সঙ্গে যুক্ত সেজন্য সচেতন শব্দটি নিয়ে একটু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন অনুভব করছি। ধরা যাক, বলা হল যে একজন স্মাগলার খুব সচেতন, তার অর্থ সে যখন খারাপ কাজ করে তখন বা অন্য সময়েও পুলিশের কাছে ধরা না পড়ার ব্যাপারে খুব সচেতন। আবার বলা হল অফিসের একজন ম্যানেজার খুব সচেতন, অর্থাৎ ম্যানেজারবাবুটি তার কাজের ব্যাপারে পাংচুয়ালিটি ও পারফেকশন মেনটেন করেন। এবার বলা হল উন্নত দেশের মানুষরা খুব সচেতন, তার মানে ওই মানুষগুলি চিন্তা বা চেতনায় অন্যদের থেকে এগিয়ে। অর্থাৎ এদের সচেতনতাবোধ অনেক বেশি। আমি আলোচনাটিকে এই সচেতন মানুষ বা এগিয়ে থাকা মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

সচেতনতাবোধ নিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকা পালন করে মিডিয়া

পৃথিবীর সব জায়গাতেই সমাজকে চেতনায় এগিয়ে নিয়ে যায় মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ, যারা চিন্তা বা চেতনায় অন্যদের থেকে এগিয়ে। আমাদের দেশের জনচেতনা প্রায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয় মিডিয়া এবং বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা। অমুক সিনেমা বা নাটকটি অত্যন্ত বাজার চলতি বা প্রগতিশীল যাই হোক না কেন, তা প্রচার পায় কোন মিডিয়ার জন্য। এবং সেই মিডিয়ার মতামতকে আমরা আমাদের 'মত' বলে চালাতে ভালবাসি।

আমাদের দেশের মিডিয়াগুলো বছরের বিভিন্ন সময় চলতি কিছু বিষয় নিয়ে প্রচন্ড হুজুগে মেতে ওঠে। যেমন ফুটবল, পুজো, ক্রিকেট, ভোট প্রভৃতি। মনে রাখতে হবে 'হুজুগ' হল যুক্তিবোধ, যা সচেতনতাবোধকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তার সবথেকে বড় শত্রু। এ বছর দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন বিকেলে লালগড় থেকে গ্রেপ্তার হলেন 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতো। সি.আই.ডি.-র অফিসাররা সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আমরা কখনোই শুনিনি তিনি আত্মগোপন করে আছেন। তবুও তিনি গ্রেপ্তার হলেন, হতেই পারেন। কিন্তু গ্রেপ্তারের পর মিডিয়ার ভূমিকা? অষ্টমী, নবমী এবং দশমীর দিনগুলোতে সব বাংলা মিডিয়াগুলো পূজার হুজুগ নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

ছত্রধরের গ্রেপ্তারের খবরটি ছিল নিছক 'ক্যাপশন' হিসাবে।

এই মিডিয়াই আবার লালগড়ে যৌথবাহিনীর অভিযানকে বিশাল গুরুত্ব দিয়ে সারাদিন কভার করেছিল। অতএব সেখানকার বিভিন্ন ঘটনা সমান গুরুত্ব দিয়ে কভার করার নৈতিক দায় থেকেই যায় মিডিয়াগুলোর। পরিবর্তে মিডিয়াকে ডিগবাজি খেতে দেখলাম।

মিডিয়াগুলি এরপর একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করল। যার ফলস্বরূপ আমরা দেখলাম বুদ্ধিজীবিদের একটি সংগঠনের কেউ কেউ নিজেদেরকে ছিন্ন করলেন লালগড়ের আন্দোলন থেকে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমি ছত্রধর মাহাতো বা মাওবাদীদের প্রতি সমর্থন বা অসমর্থন কোনো কিছুই করছি না। মিডিয়া আমাদেরকে ভেড়া বানাতে কতটা ওস্তাদ সেটাই দেখাতে চাইলাম। প্রবীরদার বইয়ে পড়েছিলাম—কোন ভেড়ার দলের একটি ভেড়ার সামনে একটা লাঠি একটু উঁচু করে ধরলে সামনের ভেড়াটি লাফিয়ে চলে যাবে। এরপর লাঠিটি সরিয়ে নিলেও বাকি ভেড়াগুলোও একইভাবে লাফিয়ে পার হবে। আমরা সমস্ত কিছু জেনেবুঝে ধীরে-সুস্থে চলব নাকি হুজুগে লাফিয়ে লাফিয়ে চলব তা আমাদেরকেই ঠিক করতে হবে।

সচেতনতা বাড়াতে আমরা যা করতে পারি

আমরা সাধারণ মানুষ নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে দেবার চেষ্টা করতে পারি। তবে সবার আগে নিজেদেরকে পরিশীলিত করে তুলতে হবে। মধ্যবিত্তদের মত সবজান্তা হওয়ার ভান করে তা কখনোই সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত মানসিকতা এবং মধ্যমেধার মানুষেরা না পড়ে, না বুঝেই সব কিছু জেনে যান। তেমনটা হলে কখনোই নিজেদের পরিমার্জন করা সম্ভব নয়। আমাদেরকে মুক্তমনের হতে হবে, হতে হবে যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তবেই তা সম্ভব।

পরের ধাপে আমরা আমাদের পরিশীলিত জ্ঞানকে লিফলেট, নাটক, মাইম, স্টাডিক্লাস প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার করতে পারি। আড্ডা বা আলোচনার মাধ্যমেও তা প্রচার করতে পারি। যেমন আমরা ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা 'অলৌকিক নয় লৌকিক' কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মনের বিভিন্ন বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণাকে নির্মূল করি। আমাদের স্টাডিক্লাস বা সাপ্তাহিক আড্ডার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের জ্ঞানকে পরিশীলিত করি। আমাদের ম্যাগাজিন 'আমরা যুক্তিবাদী'র মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিগ্রাহ্য লেখা প্রকাশ করে মানুষের সচেতনতা বাড়িয়ে তুলি।

এরপরের ধাপে আমরা কিছু গঠনমূলক কাজ করে সচেতনতা বাড়াতে পারি।

যেমন বলা হল কাউকে সাপে কামড়ালে কখনোই তাকে ওঝা বা গুণিনের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত নয় কারণ সাপে কামড়ানোর একমাত্র প্রতিষেধক এ.ভি.এস. বা অ্যান্টিভেনাম সিরাম। এসবের পাশাপাশি সাপে কাটা রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। হাসপাতাল অনেক দূরে হলে সাময়িক চিকিৎসার জন্য গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য জনমত গঠন করে, সরকারি সাহায্য নিয়ে কীভাবে তা স্থাপন করা যায় তা নিশ্চয়ই ভাবতে হবে। সেখানে এমার্জেন্সি কিছু ভ্যাকসিন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের অন্য যে কোন গঠনমূলক কাজে সরকারি টাকা আনার চেষ্টা করতে হবে কারণ মনে রাখতে হবে আমাদের ট্যাক্সের টাকাতেই সরকার চলে। সার্বিকভাবে এই পদক্ষেপগুলোর নামই সচেতনতা।

সচেতনতা বাড়াতে সরকার যা করতে পারে

সরকারের হাতে যেহেতু প্রভূত ক্ষমতা সেজন্য সরকার ইচ্ছে করলেই অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশে দুর্নীতি হল সবথেকে বড় একটি সমস্যা। আবার দুর্নীতির মধ্যে ঘুষ একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। ঘুষের কারণে বরাদ্দ টাকা প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছয় না। আপনি জমির রেজিস্ট্রি অফিসে যান। আপনার ফাইলটি শুধুমাত্র এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে নিয়ে যেতে চাইলে গাঁটের কড়ি গুনতে হবে। আপনার চাকরির জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে। ঘুষ ছাড়া সম্ভবই নয়। ট্রাফিক পুলিশ থেকে পুলিশ স্টেশন, সেলস ট্যাক্স থেকে ইনকাম ট্যাক্স সব জায়গাতেই রমরমা ঘুষের রাজত্ব। কেন এমনটা হবে আমাদের দেশে? এখন থেকে পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ বছর আগে কোন রাজনীতিক ঘুষ নিলে বা কারো বিরুদ্ধে ঘুষ নেবার অভিযোগ উঠলে তিনি পাবলিককে মুখ দেখাতে লজ্জা পেতেন। আর এখন পার্টি ক্যাডাররাও ঘুষ নিয়ে এমন ভাব দেখান যেন—'ঘুষ নেবনা কেন, এতো গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে'। চল্লিশ বছরে যদি এই অবস্থা হয় তবে আগামী কুড়ি বছরে কী অবস্থা হবে? কি আর হবে? কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি সার্বিক সচেতনতা গড়ে তুললে আবার আগের মত প্রায় ঘুষহীন রাজত্ব ফিরে আসবে। এই ঘুষের সমস্যা এবং অন্যান্য প্রধান কিছু সমস্যা দূর করতে সরকার যা করতে পারে তা হল—

ক) শহরের বিভিন্ন জায়গায় হোর্ডিং-এ প্রচার থাকবে ঘুষ নিতে দেখলে ফোন করুন এই নম্বরে। সেইসঙ্গে যিনি জানাচ্ছেন তার পরিচয় গোপন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে যথাযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা দ্রুত নিতে হবে। যেভাবে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, কারেন্ট চুরির ব্যাপারে বিভিন্ন হোর্ডিং-এ প্রচার থাকে সেভাবে নিশ্চয় করা সম্ভব।

খ) সারাবছর বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প করতে হবে। বিষয়গুলি হতে পারে কোন রোগ বিষয়ে যেমন— পোলিও, টিবি, কুষ্ঠ, এড্‌স, ডায়রিয়া প্রভৃতি। বিভিন্ন আইন বিষয়ে যেমন— মৌলিক অধিকার, পুলিশী গ্রেপ্তারের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকা, তথ্য জানার অধিকার, এছাড়াও অন্যান্য বিষয় যেমন— বাজারে কেউ ওজনে কম দিলে কোথায় অভিযোগ জানাবেন, বা বছরে একশো দিন কাজ না পেলে কি করবেন অথবা অন্ত্যোদয় কার্ড থাকা সত্ত্বেও মাসে অন্তত পঁয়ত্রিশ কিলো খাদ্যশস্য না পেলে কোথায় অভিযোগ জানাবেন প্রভৃতি। সরকারকে এসব ব্যাপারে খুব দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে।

গ) জাতিগত বা ধর্মীয় কারণে মারামারি বা হানাহানি হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাবছর ধরে মানুষকে বোঝাতে হবে—'মানুষের একটাই ধর্ম—মনুষ্যত্ব'। এই ধারণা মানুষের মনে গেঁথে দিতে হবে যুক্তিবোধের মাধ্যমে। তারজন্য ছোট ছোট টেলিফিল্ম, সিরিয়াল, পথনাটিকা, অ্যাড ফিল্ম-এর সাহায্য নিতেই হবে। মনে রাখতে হবে সচেতনতা বাড়াতে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের কোন বিকল্প নেই।

ঘ) বিভিন্ন পথ দুর্ঘটনায় কেউ প্রাণ হারালে বা অনিয়মিত ট্রেন চলাচলের সময় আমরা দেখেছি যে—জনগণ বাস পুড়িয়ে দিচ্ছে বা স্টেশন ভাঙচুর করছে। জনগণকে হোর্ডিং বা দৈনিক পত্রিকাতে বিজ্ঞাপনের দ্বারা বোঝাতে হবে—ভাঙচুর বা বাস জ্বালানোয় আদতে ক্ষতি জনগণেরই। ট্রেনের লাইট, পাখা ভাঙলে আমরাই পরের দিন সেই ট্রেনে উঠে আলো বা হাওয়া পাব না। সেইসঙ্গে যাদের গাফিলতিতে এইসব দুর্ঘটনা ঘটে তাদের বিরুদ্ধে খুব দ্রুত এবং কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সেইসঙ্গে তা বিস্তারিতভাবে মিডিয়াকে জানাতে হবে। জনগণের কাছে স্বচ্ছ থাকার জন্যই তা প্রয়োজন। তবেই তারা নিজেদের স্বার্থে দেশের বিভিন্ন সম্পদকে রক্ষা করবে।

ঙ) বর্তমানে দেখা যায় কোথাও চোর, ডাকাত বা পকেটমার ধরা পড়লে জনগণ পিটিয়ে তাদের মেরে ফেলে। আসলে পুলিশী ব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস থেকেই জনগণ এমন আচরণ করেন। বিচার ছাড়াই কোন চুরি বা ডাকাতির জন্য কারোর মৃত্যু, নিশ্চয়ই কাম্য হতে পারে না। গণপ্রহারে মৃত্যু হুজুগের পক্ষে অর্থাৎ যুক্তির বিপরীতে কাজ করে। এর জন্য পুলিশকে ঠিকঠাক কাজ করতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে পুলিশই জনগণের ভরসাস্থল। তাহলে আমাদের দেশেও তা সম্ভব হবে না কেন? কথায় কথায় ঘুষ খায় এমন পুলিশের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। সেইসঙ্গে গণপ্রহারে যুক্ত এমন কয়েকজনকে চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে হবে।

চ) বিভিন্ন শহরে মানুষের চলার জন্য ফুটপাতের ব্যবস্থা আছে। তাতে কি, ক্যাডাররাও তো আছে। তারা পসরা সাজিয়ে দোকান দেবে কোথায়? ওদের

কথাওতো ভাবতে হবে? জনগণের ফালতু সেন্টিমেন্ট নিয়ে ন্যাকামো করা রাজনীতিকরা হয় রাজনীতি ছাড়ুন, নয়তো জনগণের অধিকার রক্ষায় সচেতন হোন। দেশের মানুষকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে রেখে, আবার হাঁটতে না দিয়ে দৈহিকভাবে পঙ্গু করেও রাখবেন নাকি? আমাদের চলার রাস্তা আমাদের ফিরিয়ে দিন।

ছ) যে সব পাবলিক প্লেসে ছেলেদের জন্য পেচ্ছাপ ও পায়খানা করার ব্যবস্থা আছে, সেসব স্থানে সমানভাবে মেয়েদের জন্যও ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যদি এ-বিষয়ে কাজ করে তাদেরকে এবং তাদের মাধ্যমে জনগণকে আরো উৎসাহিত করতে হবে। শুধুমাত্র লেডিস কামরা, লেডিস ট্রেন নয়, মেয়েদের অন্যান্য সমস্যা নিয়েও ভাবতে হবে। স্বাস্থ্যকর পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারবেন না, বলে কি ত্যাগ করার ব্যবস্থাটাও করতে পারবেন না। মনে রাখবেন, মেয়েরাও কাজকর্মের জন্য অনেক বেশি বাইরে যাচ্ছে আজকাল।

জ) আজও আমাদের দেশের অনেক জায়গায় স্বাস্থ্যকর পানীয় জলের জন্য গভীর নলকূপের ব্যবস্থা নেই। অথচ শহরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, একের পর এক ওভারব্রিজ হয়ে চলেছে। ওভারব্রিজটা সাধারণভাবে সবার চোখে পড়ে, কিন্তু ডিপ টিউবওয়েল অতটা চোখে পড়ে না। সেজন্যই কি পানীয় জলের মত একটি মৌলিক বিষয়কে ছেড়ে দিয়ে ওভারব্রিজ বানানো? রাজনীতিকরা এসব সস্তার রাজনীতি ছাড়ুন। ভুলে যাবেন না, আমাদেরও সচেতনতাবোধ বাড়ছে, বাড়াচ্ছে একশ্রেণির মানুষ।

এমন অনেক সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় নিয়ে নিশ্চয় বলা যায়। কিন্তু উপরোক্তগুলোর গুরুত্ব বেশি বলে, আমার মনে হয়েছে। পরিশেষে এটুকু বলাই যায় সচেতনতাবোধ বাড়াতে পড়াশোনার এবং আলোচনার কোন বিকল্প নেই।

ভাবা যায়?

গত কয়েক বছরে অ্যামিটি, প্রত্যয়, উত্তরাপথ, স্বীকৃতি ইত্যাদি নামের কিছু গোষ্ঠী 'মানস বাংলা' নামের এক সংস্থার ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছে। এদের কাজ এইচ আই ভির বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা, সমকামীদের সামাজিক স্বীকৃতির পক্ষে সওয়াল করা, গণিকাবৃত্তিকে আইনী করার লক্ষ্যে আন্দোলন করা প্রভৃতি। ফান্ড আসে বিদেশ থেকে। 'মানস বাংলা' পশ্চিম বাংলার অংশটির পরিচালনায় আছে। এদের চিফ্ অ্যাকাউন্ট্যান্ট অনীশ রায়চৌধুরী তার জুলাই ২০০৯ এর হিসাব অনুযায়ী জানাচ্ছেন এই সংস্থার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ১ কোটি ২০ লক্ষ। ভাবা যায়!

প্র ব ন্ধ

বেলুড় মঠের অন্দরে

প্রবুদ্ধ বাগচী

এটা ঠিক শীতের রোদ পিঠে লাগিয়ে বেলুড় মঠে বেড়াতে যাওয়া নয়। যেরকমটা যাওয়া হত সেই ছেলেবেলায়। সপরিবারে একটা দিনের জন্য টুক করে বেরিয়ে পড়া, সঙ্গে আরও কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির হয়ে নৌকাযোগে শীতের গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে ঝকঝকে তকতকে সাজানো-গোছানো বেলুড়মঠ। মাঝগঙ্গায় যখন নৌকো পেরিয়ে চলেছে, মাথার ওপরের প্রকান্ড বিবেকানন্দ সেতুর কাঠামো—তখন নৌকায় বসে ওপরের দিকে তাকিয়ে কেমন গা-ছমছম, যদি অকস্মাৎ কোনও দুর্বিপাকে ভেঙে পড়ে ওপরের ওই রাস্তা আর রেলের লাইন। আর যদি সেইসময় ব্রিজের ওপর এসে পড়ত একটা ইঞ্জিনে টানা বিরাট মালগাড়ি। ওরে বাবা, কী ভয়ংকর গুম গুম শব্দ। প্রচন্ড শক্তিধর একটা ইঞ্জিনের নেতৃত্বে ওয়াগনের দীর্ঘ মিছিল। মনের বয়স পেকে উঠবার পর অনেক পরে মনে হয়েছে, সমস্ত মিছিলের ভিতরই একরকম ঔদ্ধত্য মিশে থাকে—ওই হৃদযন্ত্রে চাপ দেওয়া অনুনাদ তোলা শব্দটাও একটা ঔদ্ধত্যের ব্যাপার।

থাক ওসব কথা। এখন আমি ঢুকে পড়েছি বেলুড় মঠের ভিতর। বেড়াতে আসা নয়। ঘোর সরকারি কাজ। অর্থাৎ উন্নয়ন যজ্ঞের সুবিশাল কর্মকান্ডে আমার ভূমিকা নেহাতই কাঠবেড়ালির। সরকারি উন্নয়নের পোড়ো বাড়ির সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের ঝোড়ো হাওয়াকে মিলিয়ে দেওয়াটাই আমার সরকারি দায়িত্ব। তার জন্য আমার সঙ্গে সরকারি প্রকল্পের নীল-নকশা, নির্দেশিকার খুঁটিনাটি। উন্নয়নের এই দিনমজুরের ভূমিকায় অভিনয় করতে এসে আমার মনে রাখা উচিৎ নয়, রামকৃষ্ণ মিশনের মতো একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কেন সরকার বাহাদুর তার উন্নয়নের রথ এগিয়ে নিয়ে যাবেন, বিশেষত 'ধর্ম জনগণের আফিম' আপ্তবাক্যের উদ্গাতা মহাজ্ঞানীর পথকেই যাঁরা তাঁদের পথ-চলার ধ্রুবতারা বলে মেনে নিয়েছেন! উঁহু, কোনও পথ নয়। বরং ধর্মে ও জিরাফে থাকার তত্ত্ব স্বীকার করে ঢুকে পড়া যাক মহারাজের নিজস্ব চেম্বারে।

মহারাজ অর্থাৎ বেলুড় মঠের গ্রামোন্নয়ন ও সামাজিক বিকাশের যে শাখা প্রতিষ্ঠান, ইনি তার অধ্যক্ষ। পরে অবশ্য জেনেছি বেলুড় মঠে এমন অনেক মহারাজ আছেন, যাঁদের আবার রয়েছে নানা উঁচু-নিচু স্তর—ভক্তদের ভাষায় বড়

মহারাজ, ছোট মহারাজ ইত্যাদি। ইনি অবশ্য সেদিক দিয়ে বেশ বড় মাপের মহারাজ, যদিও মঠের প্রশাসনিক বিন্যাসে সব থেকে বড় হলেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক। যাই হোক, রাজা-মহারাজাদের খোদ দরবারে জনগণের সেবক হিসেবে আমার অভ্যর্থনায় অবশ্য কোনও ঘাটতি হল না। যথেষ্ট সুসজ্জিত একটি ঘরে মুণ্ডিতমস্তক ও দাড়িগোঁফ কামানো গেরুয়াবসন একজন প্রায় পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই সৌম্যদর্শন মানুষ বসে আছেন। সামনে কাঁচ-ঢাকা বেশ বড়মাপের টেবিলের একপাশে দামী কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং ইন্টারনেট সংযোগকারী মোডেম। রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের দর্শনে কম্পিউটার ব্যবহারের সংস্থান ছিল কি না এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, প্রযুক্তিবিপ্লবকে মঠ ও মিশনের অন্দরে তাঁরা ঠাঁই দিয়েছেন এটা প্রত্যক্ষ সত্য। বরং প্রশ্ন ওঠে অন্য জায়গায়। গেরুয়াবসনে নিজেকে আচ্ছাদিত করে যিনি জাগতিক সুখ, বিলাস বা আরাম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার ঘোষণা করেন তার হাতে অমন দামী মোবাইল ফোন থাকার যুক্তিটা ঠিক কোথায়? যদি বলা যায়, কম্পিউটারের মতো ওটাও একটা জরুরি ব্যবহার্য তাতে হয়তো মন সায় দিত; কিন্তু আমার সঙ্গে দরকারি কথা সারতে সারতে মহারাজ আসলে বার করেছেন তার দ্বিতীয় মোবাইলটি। যিনি সংসার ত্যাগ করে পূর্বাশ্রমকে ভুলে যেতে পারেন, বাহুল্যবর্জিত গেরুয়াবসন যাঁর অবলম্বন, প্রযুক্তি-উপকরণ নিয়ে এই বাহুল্য কি কোথাও একটা চোখে লাগে না আমার? কিন্তু, ওই যে বললাম, প্রশ্ন নয়। আমি এখানে কোনও প্রশ্ন করতে আসিনি। সুতরাং আমাদের দরকারি কথাবার্তা এগোতে থাকে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ব্যাঙ্ক ঋণ, উৎপাদিত দ্রব্যের মার্কেটিং। কথার মাঝে এক মহিলা এসে ঢোকেন ঘরে। কী আশ্চর্য, তিনি মহারাজের পায়ের কাছে বসে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন আর কী অবলীলায় তাঁর পদযুগল মহিলার দিকে এগিয়ে দেন তিনি। কি জানি, আমি তো মহারাজের প্রজা নই, ভক্তির স্বরূপ বুঝব আমার সাধ্য কী! তবু আমার কেমন যেন আড়ষ্ট লাগে, গা-শিরশির করে! আমার কাছে কোনও অনুগ্রহপ্রার্থী এলে আমি কি পারি আমার পা তার দিকে এগিয়ে দিতে? বরং কেউ পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে এলে কেমন যেন নিজেরই সংকোচ লাগে। নিজেকে উচ্চমার্গীয় কেউকেটা ভাবার এই যে দৃষ্টান্ত, এর মধ্যে কি কোথাও লুকিয়ে থাকে আত্মগরিমা? অহংকার? বিবেকানন্দ সেতুর ওপর দিয়ে পার হয়ে যাওয়া ওই আত্মগর্বী মালগাড়ির মতো? গুম-গুম-গুম-গুম আওয়াজ পেতে থাকি ওই সুশোভিত ঘরটায় বসে।

২.

সেদিন ছিল আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভারম্ভের দিন। বেশ সকাল সকালই পৌঁছে গিয়েছিলাম বেলুড় মঠে। সেখান থেকে এক মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে (ইনি অবশ্য পদাধিকারে অধ্যক্ষ মহারাজের পরের ধাপে) আমাদের যেতে হবে

অনুষ্ঠানস্থলে। গাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে মহারাজের সঙ্গী হলেন তাঁর এক অনুচর। পেছনের সিটে আমি আর ছোট মহারাজ। সামনে চালকের পাশে সেই অনুচর। গাড়ি স্টার্ট করামাত্র অনুচরটি কিছু দুর্বোধ্য ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ করলেন যার প্রতিধ্বনি শোনা গেল মহারাজের কণ্ঠে। বিস্মিত আমি নীরব হয়ে তাকিয়ে থাকলাম এই বিচিত্র কান্ডকারখানার দিকে। এই মন্ত্র শেষ হল 'গঙ্গা মাঈকি জয়' এই উচ্চারণে—কিশোরী মেয়েদের স্বনির্ভর করার প্রকল্পের সঙ্গে 'গঙ্গা মাঈ'-এর কী সম্পর্ক, সম্ভবত শার্লক হোমসও তার রহস্যভেদ করতে ব্যর্থ হয়ে গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিতেন!

পরে জেনেছি, মঠের ভোকাবুলারিতে এটাকে বলে 'জয় দেওয়া'—সম্ভবত ব্যাকরণগত ত্রুটিটুকু শুধরে নিয়ে যেটাকে ধরা যেতে পারে 'জয়ধ্বনি দেওয়া' অর্থাৎ যাত্রারম্ভে অদৃশ্য দেবলোকের সিনিয়র সিটিজেনদের স্মরণ করা! ঠিক যেমন পথে বেরোনোর আগে আমাদের মা-মাসীরা এখনও দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে থাকেন। কিন্তু এই এপিসোডের কৌতুককর অংশটা অন্যত্র। সেটা দেখা গেল ওইদিনই বেলা দুটোর পরে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সেরে আমরা এবার যাব সেই অনুমোদিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটিতে যেখানে আগামী একমাস ধরে চলবে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ। ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন জেলার অন্য এক সরকারি আধিকারিক ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক সমিতির প্রধান। ঘটনাচক্রে দুজনেই মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা। মনে মনে ভাবছি গাড়িতে কীভাবে আমরা চারজন সুষ্ঠুভাবে বসব। সৌজন্যবশত আমার নিশ্চয়ই উচিৎ তিনজন আমন্ত্রিত অতিথিকে পেছনে বসতে বলে নিজে সামনে বসা, সাধারণ রীতি এমনটাই। কিন্তু মজা হল, গাড়ির কাছে পৌঁছে দেখলাম ছোট মহারাজ আগেই সামনের সিটে বসে পড়েছেন। তাঁকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করলাম পিছনের সিটে স্বচ্ছন্দভাবে বসতে। কিন্তু তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। বুঝলাম দুজন ভদ্রমহিলার পাশে বসতে তাঁর কিছু আড়ষ্টতা কাজ করছে। কেন এই সংকোচ? ব্যক্তিজীবনের কামনা-বাসনা যিনি পরিত্যাগ করে এসেছেন, তাঁর চেতনায় কি এই কুণ্ঠার অবকাশ থাকা সংগত? তাছাড়া, আমরা যাঁরা গেরুয়াবসন পরি না বা মুন্ডিতমস্তকে ত্যাগের মহত্ত্ব প্রচার করি না এবং ব্যক্তিজীবনের কামনা-বাসনাকে অস্বীকার করি না তাঁরা কি পরিচিত ভদ্রমহিলার পাশে বসার সঙ্গে কামনার স্পন্দনকে এক করে ফেলি? এমন হলে তো সেটা সভ্যতার সংকট! উচ্চমার্গীয় মহারাজ কি তবে গেরুয়ার আড়ালে সত্যি কিছু গোপন রেখেছেন? ঘোষিত ত্যাগের অন্তরালে কি তবে থাকে একরকম অবদমন? এই প্রশ্নের জবাব পেয়েছিলাম কয়েকমাস পর। তবে সে-কথা এখন নয়। এখন আমরা চলে যাই একমাস পরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চে।

এইদিন আমার সঙ্গী হয়েছেন মিশনের আরেক মহারাজ। যিনি একইভাবে অধ্যক্ষ মহারাজের পরের ধাপে অবস্থান করেন। এদিনও জয়ধ্বনি দিয়ে গাড়ি ছেড়েছে মঠপ্রাঙ্গন থেকে। তুলনায় যুবাপুরুষ এই মহারাজ বেশ মিশুকে। সন্ন্যাসীরা নীতিগত ভাবে পূর্বাশ্রমের কথা প্রকাশ করেন না বলে শুনেছি, কিন্তু ইনি গাড়িতে আসতে আসতে আমার কাছে প্রকাশ করে ফেলেছেন আসলে তিনি একজন প্রাক্তন সেনানী। কথায় কথায় তিনি বলতে থাকেন চাকরিজীবনে তাঁর দেখা প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনা-সংক্রান্ত নানা দুর্নীতির আখ্যান। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়েও দুয়েকটা আলগা মন্তব্য ভেসে আসে তাঁর মুখে। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীর মুখ থেকে এই ধরণের বক্তব্য শোনা বেশ বিরল অভিজ্ঞতা।

কিন্তু এই মুহূর্তে মহারাজ তাঁর বক্তব্য রাখতে আরম্ভ করেছেন মঞ্চের সামনে বসা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে। আবারও এক দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ। তারপর তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিতে থাকেন মহারাজ। এই মন্ত্রের তাৎপর্য কী? মহারাজ বলতে থাকেন, এই মন্ত্র তোমাদের মনে এক গভীর বিশ্বাস ও প্রত্যয় জাগিয়ে তুলবে। যে প্রশিক্ষণ তোমরা পেলে, তাকে নিজেদের জীবনে কাজে লাগিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তোমাদের। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে, পরিবারকে সুরক্ষা দিতে হবে। তোমাদের চারপাশের প্রতিবন্ধকতাকে পেরিয়ে যেতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু এরপর তিনি এক আশ্চর্য কান্ড করলেন। বক্তব্য থামিয়ে আবার একটা মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, এই মুহূর্তে তোমাদের চারপাশে নানান ভূত-প্রেত-অন্ধকার আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে! এই মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সব ক্ষতিকর শক্তির প্রভাব নষ্ট হয়ে গেল, এবার তোমরা নিরাপদ। তোমাদের আগামী দিনের চলার পথ এখন বিপন্মুক্ত! মহারাজের পাশের চেয়ারে বসে আমি রুদ্ধবাক। পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি তাঁর ভাবলেশহীন মুখের দিকে। মহারজের বিশ্বস্ত অনুচর ততক্ষণে যোগ দিয়েছেন মহারাজের সঙ্গে। যৌথকণ্ঠে তাঁরা প্রার্থনা করছেন : অসদোমা সদগময়ঃ তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ আর আমি ভাবছি, কাকে বলে অন্ধকার আর কাকেই বা বলে আলো! কে কাকে নিয়ে যাবেন অন্ধকার থেকে আলোর মুক্তিতে?

মনে পড়ছে, এই ঘটনার মাত্র ক'দিন আগে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিতে তাঁরা আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন ভারতবর্ষের প্রযুক্তি বিপ্লবের পুরোধা পুরুষ স্যাম পিত্রোদাকে! তাহলে আসল সত্যি কোনটা? স্যাম পিত্রোদা না মন্ত্রবলে উধাও হয়ে যাওয়া প্রেতপুরুষ? ওহো, ভুলেই গেছি! আমার তো প্রশ্ন করা বারণ!

৩.

আরও কয়েকমাস পরের কথা। সেদিনও সকাল দশটা নাগাদ এসে পৌঁছেছি

বেলুড় মঠে। নিতান্তই কিছু সরকারি প্রয়োজনে। কী কারণে সেদিন অফিস একেবারে ফাঁকা। অধ্যক্ষ মহারাজের ঘর বন্ধ। অফিসের অন্যান্য কর্মচারীরা কেউ নেই। অধ্যক্ষের পাশের ঘরে অবশ্য আলো-পাখা চলছে। কী করব ভাবছি, এমন সময় অফিস-সংলগ্ন হোস্টেলের একজন শিক্ষার্থীই সম্ভবত হবে, আমায় এসে জিজ্ঞাসা করল আমার আগমনের হেতু। আমি জানতে চাই কোনও মহারাজ আছেন কি না, কারণ তাঁদের কাউকে ছাড়া আমার প্রয়োজনটা মেটার নয়। ছেলেটি সবিনয়ে জানায়, বড় মহারাজ শহরের বাইরে, একজন ছোট মহারাজ আজকে উপস্থিত আছেন। ওই আলোজ্বলা ঘরটির দিকে সে আঙুল দেখায়। সেই ঘরের দিকে এগিয়ে যেতেই আমার কানে আসে অস্পষ্ট একটা সুর। মনে মনে ভাবি, কাজ শুরুর আগে হয়তো এটা কোনও প্রার্থনা-সংগীত, যাতে স্নাত হয়ে দিনের কাজে উদ্বোধিত হতে চাইছেন মহারাজ।

দরজার সামনে দাঁড়াতেই চোখে পড়ে তাঁকে। নিজের টেবিল থেকে ডানদিকে ঘুরে সেদিককার টেবিলে রাখা কম্পিউটারে একমনে কাজ করছেন তিনি। প্রথম দিনের সেই ছোট মহারাজ। যিনি গাড়ির পেছনের সিটে বসতে নারাজ। মহারাজ আমাকে দেখতে পাননি। কিন্তু আমি দেখতে পাই কম্পিউটার পর্দায় অজস্র তথ্যের সারি। আর ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াতেই ওই হালকা অস্পষ্ট সুরের ইশারা আরও স্পষ্ট। কম্পিউটারের সিডি রমে গান শুনছেন আমাদের ছোট মহারাজ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ত্যাগের বা কর্মযোগের আদর্শে দীপ্ত কোনও সংগীত নাকি? না, আমার অভ্যস্ত কান একটুও ভুল শোনে না। অত্যন্ত নিচু ভলিউমে কম্পিউটার-সংলগ্ন স্পিকার থেকে ভেসে আসছে সেই গান : আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি। মনে হয় সে যেন গো কিছু নয়। কেন আরও ভালবেসে যেতে পারে না হৃদয়.......

আবারও স্তব্ধবাক আমি স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি ঘরের মধ্যে! মুন্ডিতমস্তক গেরুয়াধারী এক সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী তখন বিভোর হয়ে আছেন প্রেমস্নিগ্ধ সুরের মূর্ছনায়।

জবাবটা পেয়ে গেছি বলেই হয়তো আর আমার মনে কোনও প্রশ্ন জাগে না!

বি শে ষ প্র ব ন্ধ

আমাদের ধর্মচিন্তা : একটি ব্যক্তিগত প্রতিবেদন

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

শিরোনাম দেখে ভাববেন না এটা কোন জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ। সে এলেম আমার নেই। সেই জ্ঞান-গম্যি-পড়াশুনো কিছু নেই। তবুও এটা লিখছি কেন? গল্প উপন্যাস লিখি বলে। যে চরিত্রগুলো আমার লেখায় হাজির হয়েছে, তারা অনেকেই মধ্যবিত্ত, আবার মধ্যবিত্তরা যাদের ছোটলোক মনে করেন, তারাও অনেকে আমার গদ্যে আছেন। বেশ কিছু নাস্তিক আছেন, তাঁদের চরিত্রগুলো নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ওদের ধর্মচিন্তাও চিন্তা করতে হয়েছে মাঝে মাঝে। সবার মধ্যেই এক ধরনের ধর্মবোধ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে মানুষের যে ধর্মের কথা বলা হয়েছে, সেই ধর্মবোধ নয়, একেবারে মোটা বুদ্ধির যে ধর্মবোধ, যেটা কিছুটা রিলিজিয়ন, কিছুটা অহঙ্কার, কিছুটা রিচুয়াল, কিছুটা অভ্যেস—সব মিলিয়ে এবং ইন্দ্রজিত নাটকের যে পুনঃপৌণিক সংলাপটি ''সব্বাই করে বলে সব্বাই করে তাই''—এই ধর্মাচারণের কথা বলবার চেষ্টা করেবা এই নিবন্ধে।

হিন্দুত্ব বলতে কী বুঝি ঠিক করে বলতে পারব না। এখনকার হিন্দুরা বৈদান্তিক নয়, মায়াবাদী নয়, দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদী কোনটাই নয়, নাস্তিকও নয়, আবার খুব ধর্মভীরুও নয়। হিন্দুদের লিখিত কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। আচারপদ্ধতি নেই। কি কি করণীয় এবং করণীয় নয় এ নিয়ে স্মৃতিশাস্ত্র লেখা হয়েছে। কিন্তু নানা স্মৃতিকার নানারকম বিধান দিয়েছেন। মনু একরকম, বৃহস্পতি অন্যরকম, আবার আমাদের জীমূতবাহন অন্যরকম। বাংলার রঘুনন্দন তো ব্রাহ্মদের মৎস্য ভোজনও অনুমোদিত করে দিয়েছেন। না করে উপায় ছিল না। দেশ জুড়ে এত জল, এত মাছ, মিথিলা এবং কনৌজ থেকে আমদানী করা নিরামিশাষী বামুনরা লোভ না সামলাতে পেরে গোপনে মাছ খাচ্ছিল। ব্যাপারটা আর গোপন রইল না। শেষকালে মৎস্য ভোজন অবিধেয় নয় এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হল। কারা কারা শূদ্র শ্রেণিতে পড়বে, সেটাও বাংলায় আলাদা। কার ক'দিন অশৌচ, সেইসব বিধানও পাল্টেছে। সুবর্ণ বণিকদের রাতারাতি শূদ্র করে দেয়া হল। কুলীনপ্রথা তৈরি হল—এসব বাংলার নিজস্ব ব্যাপার।

বাংলায় ব্রাহ্মণরা এসেছে অনেক পরে। বাংলায় আগে কৌম রাষ্ট্র ছিল। সুহ্ম,

পৌণ্ড্র, সমতট রাঢ়, এসব নাম ছিল। পাল রাজাদের আগে বোধহয় ঠিকঠাক রাজতন্ত্র ছিল না। তখন থেকেই ব্রাহ্মণ আমদানী হতে লাগল উত্তর ভারত থেকে, মগধ, মিথিলা থেকে। সেন আমলে আরও বেশি করে। ঠিকঠাক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই সেনরাজারা হেরে গেলেন। মুসলিম রাজত্ব শুরু হল। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিবর্তন চলতে লাগল ক্রমশ সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে। লৌকিক দেবদেবীদের ব্রাহ্মণীকরণ হতে লাগল। শীতলা, মনসা, ঘেঁটু এরা সব জাতে উঠলেন। ক্রমশ সত্যপীর সত্যনারায়ণ হল। ওলাইচন্ডী, মঙ্গলচন্ডী এদেরও বেশ রমরমা হল। কিছু পুরোন দেবদেবী কৌলীন্য হারালেন। দেবাদিদেব ব্রহ্মার কোন পুজো নেই বাঙালীদের মধ্যে। অগ্নিও পাত্তাহীন হয়ে গেলেন। বরুণ-ইন্দ্র এসব বৈদিক দেবতা তুচ্ছ হয়ে গেলেন। কালী এলেন বেশ জাঁকিয়ে। যোদ্ধা কার্ত্তিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয়ে গেলেন গোঁফছাঁটা বাবরি চুলওলা বাবু কার্ত্তিক। বিদ্যাসাগর-হেয়ার সাহেব বেথুন সাহবের পরবর্তীকালে সরস্বতী পেলেন আলাদা গুরুত্ব। দেবী দুর্গা প্রকট হলেন হৈ-হৈ দেবী রূপে। বিশ্বকর্মার বেশি করে দরকার হল বাংলায় কলকারখানা হবার পর শ্রমিকমালিকের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কে আঠা লাগাবার জন্য। বাঙালীদের ঠাকুরের আসনে ২৫/৩০ বছর আগে হঠাৎ আবির্ভাব ঘটল সন্তোষীমায়ের। ট্যুরিজমের কল্যাণে বাঙালী মধ্যবিত্তের ঠাকুর ঘরের দেয়ালে ঝুলল বেঙ্কটেশ্বরের চোখ বাঁধা ছবি, কিম্বা বৈষ্ণোদেবী মাতাজি। বুদ্ধদেব অনেক আগেই বিষ্ণুর অবতার হয়ে গিয়েছিলেন। অনেক বাড়িতে বুদ্ধদেবের ছবি আছে, আছে যীশুর ছবিও। যীশুর ছবিতে পঁচিশে ডিসেম্বর মালা পরানো হয়। হজরত মহম্মদের কোন ছবি নেই, থাকলে প্রগতিশীল (হিন্দু) বাঙালী মধ্যবিত্তের ঘরে অর্চিত হতেন। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার—বাঙালী হনুমানকে ঠিকভাবে নিল না। বাঙালীর ঠাকুর ঘরে হনুমানের অভাব।

সর্বপ্রাণবাদ নামে একটা দর্শন আছে। তাতে মোটামুটিভাবে বলা হয় ঈশ্বর সর্বব্যাপী এবং এক বিশেষ শক্তি। যে শক্তির বহিঃপ্রকাশ হল এই জীবজগৎ অরণ্য নদী। সাঁওতাল-মুন্ডা-হো-রা একে এককথায় বলে শরণা ধর্ম। এরা ভাবেন প্রধান দেবতা মারাংবুরু তাঁর শক্তি ছড়িয়ে রেখেছেন প্রকৃতি জুড়ে। যখন আরণ্যচারী মানুষ ক্রমশ কৃষিজীবিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল, তখন জঙ্গল নিধনের দরকার হচ্ছিল। কিন্তু যেখানে গ্রাম পত্তন হচ্ছিল, অর্থাৎ বসতি, সেখানে বেশ কয়েকটা প্রাচীন বৃক্ষ রেখে দেয়ার নিয়ম। বিশ্বাসটা এরকম—জঙ্গলের পরিব্যাপ্ত শক্তি এই অকর্তিত বৃক্ষগুলির মধ্যে ঘনীভূত থাকবে। ঐ না কাটা গাছগুলিই হল আদিম জঙ্গলের ঘনবদ্ধ রূপ এবং এখানেই ঈশ্বরিক শক্তির অধিষ্ঠান।

এগুলিকেই বলা হয় ‘থান’। এইসব থানে কোন মূর্তি নেই, কিন্তু লোকবিশ্বাস

হল এই থানেই বিরাজ করেন শক্তি। সাঁওতাল মুন্ডা-হো গ্রামগুলিতে এইসব থানগুলির কোন পৃথক নামকরণ হয়নি, কিন্তু যাবতীয় ধর্মীয় কার্য্যকলাপ এই থানগুলিতেই হয়। আমাদের পশ্চিমবাংলার রাঢ় অঞ্চলে এইসব থানগুলির নামকরণ হয়েছে কোন দেবদেবীর নামে। সবাই লৌকিক দেবদেবী। শাস্ত্রে এদের নাম নেই। পুরোহিত দর্পণে এদের পূজাবিধি নেই—যেমন পোড়ামা, বুড়োঠাকুর, কঙ্কালী, ধেড়াই চন্ডী, বোড়াম, খেঁদিমা, তারিণী এরকম আরও কত। এইসব থানের দেবদেবীর নামযুক্ত হয়তো কয়েকটা পাথর আছে, কিম্বা ঢিবি। এখানে অনেকে মানসিক করে মাটির ঘোড়া রেখে যায়। এই থানের (স্থান থেকে আসা) মাহাত্ম্যকে বিশ্বাস করা হয়। ভাবা হয় জায়গাটা পবিত্র, শূচিতা রাখার চেষ্টা করা হয়। এর আশেপাশে মানুষ মলমূত্র ত্যাগ করে না, এমনকি যাতে গরুছাগলও নোংরা না করতে পারে সেটা দেখা হয়। গ্রামের উচ্চ বর্ণের মানুষরা এইসব লৌকিক ব্যাপারটাকে বিশেষ পাত্তা না দিলেও মধ্যবিত্ত মানসিকতায় ধর্মচারণের ব্যাপারে স্থানমাহাত্ম্যটা ঢুকে বসে আছে। অমুক অমুক ঠাকুর খুব জাগ্রত এরকম একটা বিশ্বাস আছে। স্থান মাহাত্ম্যটা শুধু বাঙালী কেন ভারত জুড়েই আছে। এর উৎস বোধহয় আদিবাসীদের সেই 'থান'।

আর্য্যরা আসার আগে ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে যে ধর্মবোধ ছিল সেটা মূলত সর্বপ্রাণবাদ। মোটা কথায় যাকে বলা হয় গাছপালাকে পুজো করা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী যে শক্তি, তাকে তুষ্ট রাখা। এজন্য পশুবলি দেবার প্রথা ছিল। মৃত্যুর পর সব শেষ হয়ে যায় না, এরকম একটা বিশ্বাস সব ধর্মেই আছে। আদিধর্মেও ছিল। আর্য্য আগমনের পর যাগ-যজ্ঞ, আহুতি এসবের সঙ্গে 'বলি'ও মিশে গেল। বর্ণভেদ এল। ব্রাহ্মণদের নানা সুযোগ সুবিধা ধর্মের মধ্যেই ঢুকে গেল। নানারকম দর্শনের সৃষ্টি হল। অদ্বৈতবাদ, সাংখ্য, পতঞ্জলি, কত কী। কিন্তু বাঙালী মধ্যবিত্তরা কোন দর্শনেই বিশ্বাস করে না। যারা বাঙালি বৌদ্ধ মধ্যবিত্ত, তাঁরা পরিচিতিতে বলেন আমি ভাই 'বুঢ্‌ঢিস্ট', কিন্তু ঘরে বড়জোর বুদ্ধের ছবির সামনে প্রদীপ জ্বালানো ছাড়া আর কিছুই করেন না। মধ্যবিত্ত বাঙালি খ্রিস্টানরাও ২৫শে ডিসেম্বর একটু হৈ-চৈ বেশি করেন। কেউ কেউ হয়তো রবিবারের চার্চেও যান। ঘরে একটা বাইবেল রাখেন। কিন্তু দুর্গাপুজোয় সিঁদুর খেলতে কোন অসুবিধে হয় না। মুসলিম বাঙালি মধ্যবিত্তরা শুয়োরটা খান না, রমজান মাসে রোজা না রাখলেও ঈদের দিনে বন্ধুবান্ধবদের ডেকে খাওয়া দাওয়া করেন। মানে বলতে চাইছি, অন্তর্গত দর্শন নিয়ে মাথা ঘামান না, বরং বাহ্যিক আচারের দিকটাই কিছুটা মানেন।

আমরা এখন যেটাকে হিন্দু ধর্ম বলি, আসলে এটা এখন কিছুটা বাহ্যিক আচার। অভ্যেস। কোন পঞ্জিকা খুললে দেখবেন—বারবেলা, কালবেলা, যাত্রা-নাস্তি,

শুভযোগ এসব আছে। মধ্যবিত্তরা বহুদিনই পঞ্জিকা মেনে চলেছে। এখন অবশ্য পঞ্জিকা দেখে যাত্রার সময় ঠিক করা হয় না, কারণ উপায় নেই। এখন টিকিট পাওয়া না পাওয়ার উপর যাত্রা নির্ভরশীল। তাই পঞ্জিকা নয়, কম্পিউটার দেখেই যাত্রার দিন ঠিক করতে হয়। কিন্তু বিয়ে, অন্নপ্রাশন এসব পঞ্জিকা দেখেই ঠিক হয়। যারা রেজিস্ট্রি বিয়ে করে, তাঁরাও পঞ্জিকায় বিয়ের দিনটা দেখে নেয়।

বাঙলা পঞ্জিকায় একটা চ্যাপ্টার থাকে, 'দশবিধ সংস্কার'। যা হিন্দুদের অবশ্য পালনীয়। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ। এরপর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ এবং গয়ায় পিন্ডি। গর্ভাধান মানে হল দিনক্ষণ ঠিক করে গর্ভদান করা। পুংসবন মানে হল পুত্রসন্তানের কামনা করে হোম করা। গর্ভ হবার চল্লিশ দিনের মাথায় করতে হত। আটমাসের সময় একটা অনুষ্ঠান ছিল সীমন্তোন্নয়ন। সীমন্তোন্নয়নের ক্রিয়াটি হল সীমান্ত বা সিঁথি তুলিয়া দেওয়া। শৃঙ্গার বেশে পতিগামিনী হইবেন না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরই জাতকর্ম করতে হত। মানে সন্তানের পিতা সদ্যোজাত সন্তানের জিভে মধু ছোঁয়াতো, দেহে সোনা ছোঁয়াতো, সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার দশদিনের মাথায় নামকরণ করতে হত। নামকরণ হত জন্মতারিখ ও সময়ের উপর নির্ভর করে। অন্তত নামের প্রথম অক্ষরটা রাশি নক্ষত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ছ'মাসের মাথায় অন্নপ্রাশন, আট মাসে বা দশ মাসে চূড়াকরণ। চূড়াকরণ মানে হল জন্মকালীন চুল ফেলে দেয়া, মানে নেড়া করে দেয়া। আট বছরে উপনয়ন। শূদ্র ছাড়া সবারই পৈতে দিতে হত। আট থেকে বারো বছরের মধ্যেই পৈতে দিতে হত। প্রায়শ্চিত্ত করে ষোল বছর পর্যন্ত টেনে নেয়া চলতো। উপনয়নের পর গুরুগৃহে গিয়ে পড়াশুনো। পড়াশুনো শেষ করে সমাবর্তন। তারপর বিবাহ।

এখন অন্নপ্রাশন, উপনয়ন আর বিবাহ ছাড়া বাকি সবই উঠে গেছে। নামকরণটা অন্নপ্রাশনের দিনেই হয়। আর উপনয়ন মানে পৈতেটা কেবল বামুন বাড়িতেই হয়। উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গেই সমাবর্তনের কাজটাও সেরে ফেলা হয়। নিয়ম ছিল উপনয়নের পর গুরুগৃহে গিয়ে বারো বছর ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হবে। সংযমী জীবন ধারণ করতে হবে। গুরুগৃহ উঠে গেল, কিন্তু পৈতে রয়ে গেল। কারণ ঐ উপবীতটাই তো উচ্চবর্ণের প্রতীক। বাঙালী মধ্যবিত্ত বারো বছরের ব্রহ্মচর্য্যকে এক বছরে নামিয়ে আনলো। আমার যখন পৈতে হয়েছিল, গুরুজনরা বলেছিলেন এক বছর ডিম খেতে পাবে না। বাইরের খাবারও চলবে না। দুবারের বেশি ভাত খাওয়া চলবে না। এই শর্টকাট ব্রহ্মচর্য্যে মাছ খাওয়া চলতো, পাঁঠার মাংসও অবিধেয় ছিল না।

ঐ বারো বছরের সংযম পালন এক বছরের হয়ে গেল—এ ব্যাপারে কোন শাস্ত্র নির্দেশ নেই। মধ্যবিত্তরাই এটা করেছেন। ক্রমে এক বছরটা এক মাস হয়ে

গেল। কিছুদিন আগে আমার ভাগনের পৈতে হল। পৈতে হল কারণ বিয়ে ঠিক হল। বিয়েটা ঠিক হয়েছিল বিজ্ঞাপন দিয়ে। পুরোহিত ডেকে অগ্নিসাক্ষীর বিয়ে, সুতরাং ব্রাহ্মণ সন্তানের গলায় পৈতে থাকবে না, তা কি করে হয়? কালীঘাটে গিয়ে পৈতে দেয়ানো হল। নেড়া হতে হল না। ব্রাহ্মণকে মূল্য ধরে দিতে হল। সকাল বেলাটায় উপোস ছিল ভাগনে। উপোসে চা চলে। এটাও মধ্যবিত্তদের নিজস্ব বিধান। পৈতে দান হল। ব্রহ্মচারী দন্ডধারী হয়ে গেল, ভিক্ষা নেয়া হয়ে গেল, সমাবর্তনও হয়ে গেল। সব নিয়ে দু' ঘন্টা। এরপর চাইনিজ হোটেল।

এরকম ভাবে অনেক ব্যবস্থাই মধ্যবিত্তরা নিজেদের মত করে তৈরি করে নিয়েছে। দেবতাদের যেসব খাদ্যদ্রব্য উৎসর্গ করে তা হল ফল ও মিষ্টি। মিষ্টিটা প্রথমদিকে চিনি-মিছরি জাতীয় কিছু ছিল। দুধ ব্যবহৃত হলে প্যাঁড়া তৈরি করে দেয়া হত। কোন মন্দিরের মূল প্রসাদ হল—প্যাঁড়া। রসগোল্লা চলে না। কারণ রসগোল্লায় ছানা দরকার হয়। 'ছিন্ন' শব্দটা থেকেই ছানা এসেছে। দুধকে ছিন্ন করে ছানা তৈরিটা ভালোভাবে নেয়নি হিন্দু ধর্ম। তাই ছানার মিষ্টি পুজোয় চলে না। কিন্তু বাঙালী মধ্যবিত্ত পুজোয় সন্দেশ দিচ্ছে। সন্দেশ তো ছানা থেকেই তৈরি। আপনাদের পাড়ার পুজোর প্যান্ডেলে আপনি সন্দেশের প্যাকেট নিয়ে যান, পুরোহিত বা কর্মকর্তারা কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আপনি হাঁড়ি নিয়ে যেতে পারবেন না। পুজোয় রসগোল্লা-পানতুয়া-লেডিকিনি চলে না।

যে পাত্রে উৎসর্গ করা হয় সেই পাত্র সম্পর্কে পঞ্জিকায় শুদ্ধপাত্র হেডিং-এ বলা আছে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, প্রস্তর ও কাষ্ঠপাত্র শুদ্ধ পাত্র।

দেখুন পেতল শুদ্ধ পাত্র নয়, কিন্তু পেতল চালিয়ে দিচ্ছি। কাঁসা চলছে না, কিন্তু আজকাল স্টিলও চালিয়ে দিচ্ছি। এখনো চিনেমাটি কিম্বা প্লাস্টিক চলছে না, কিন্তু ঠিকই চালিয়ে দেয়া যাবে। কোন ধর্মগুরুর দরকার হয়না, বাঙালি মধ্যবিত্ত তার ধার্মিক ক্রিয়াকলাপ নিজের মত করে সেট করে নেয়। হিন্দুধর্মের অনেকগুলি ভাগ ছিল। শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত ইত্যাদি। প্রতিটি ধারার উপভাগ আছে। বঙ্গদেশে যদি বৈষ্ণবদের কথাই ধরি, দেখব গৌড়ীয় বৈষ্ণব আর দক্ষিণ ভারতীয় বৈষ্ণবদের কত তফাৎ। আবার বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের মধ্যেও ভাগাভাগি আছে। দেখা হলে প্রথম সম্ভাষণটাই দেখুন, কেউ বলে জয় গৌর, কেউ বলে জয় রাধে, কেউ বলে হরে কৃষ্ণ, কেউ বলে জয় নিতাই...। যারা জয় নিতাই বলে তাঁরা নিত্যানন্দ পন্থী। এদের ক্রিয়াকলাপ গৌরাঙ্গপন্থীদের চেয়ে আলাদা। এছাড়া আছে কর্তাভজা, বলরামী ইত্যাদি। তবে এঁদের মধ্যে মধ্যবিত্ত তেমন নেই। ভেবে দেখেছি, মধ্যবিত্ত তাঁরাই যারা পরস্পরকে বাবু বলতে পারে। আপনার পাড়ার রিক্সাওয়ালার নাম যদি মদন হয়। আপনি ওকে মদনবাবু বলতে পারবেন না। কিন্তু আপনার বাড়ির যে সিকিউরিটি গার্ড, যার রোজগার মাসে দু' হাজার টাকা, রিক্সাওয়ালা মদনের

চেয়েও কম। তাঁর নাম মদন হলে ওকে আপনি মদনবাবুই ডাকবেন। আপনার সাফাইওলা কখনো মদনবাবু হবেন না, কিন্তু ইলেকট্রিক মিস্ত্রি মদনবাবু হতেই পারেন। আপনার অফিসের পিওনটিকে আপনি বাবু নাও ডাকতে পারেন, কিন্তু দুজন পিওন যখন কথা বলেন, তখন পরস্পরকে বাবু সম্বোধনই করেন, কিন্তু দুজন রিক্সাওয়ালা নিজেদের বাবু সম্বোধন করে না।

যারা অবাবু বাঙালি, মানে মধ্যবিত্ত নয়, তাঁদের ধর্মভাবনায় অত জটিলতা নেই। ওরা মনসা-শীতলা-ওলাবিবিকে বিশ্বাস করেন। মনে করেন এইসব দেবদেবী সত্যিসত্যিই আছেন। স্বর্গনরকেও বিশ্বাস করেন। জলপড়া-চরণামৃতেও আস্থা আছে। এঁরা বিশ্বাস করেন বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।

কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্তদের ধর্মবোধ বেশ জটিল। কিছুতেই ঠিকমত বিশ্বাস নেই, আবার পুরোপুরি অবিশ্বাসও নেই। এছাড়া মধ্যবিত্তরা মিশিয়ে নিয়েছেন অনেক কিছু। কেক-দোসা-ইডলি-প্যাড়া-উপমা-চাউ—সবই বাঙালি মধ্যবিত্ত নিজেদের করে নিয়েছে, নিজেদের মত করে। বাঙালি চাউমিনে হলুদ দিচ্ছে, দোসার মশলায় ধনেপাতা দিচ্ছে, তেমনি করেই বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুরা বৈষ্ণব, তান্ত্রিকতা, শৈবমত, লোকায়ত বিশ্বাস সবই মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়েছে এমনকি কিছুটা ক্রিশ্চিয়ানিটি। চীনা ফেংসুই এখন বাঙালির নিজের।

বাঙালী মধ্যবিত্তের ধর্মবিশ্বাসকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১. যারা পুরো নাস্তিক। এঁরা ঈশ্বর, আত্মা, ভূত, প্রেত, জিন, পরী, স্বর্গ, নরক কিছু বিশ্বাস করেন না। এবং শ্রাদ্ধ, উপনয়নাদি কিছুই করেন না।

২. ঈশ্বরের ব্যাপারে একটা প্রশ্নচিহ্ন আছে। বলা যায় সংশয়বাদী, তবে আত্মায় বিশ্বাস আছে।

৩. ঈশ্বর, আত্মা অলৌকিক ব্যাপার, পাথর, তাবিজ-মাদুলি সবকিছুতেই বিশ্বাস আছে।

৪. কিছুতেই পুরোপুরি বিশ্বাস নেই, আবার অবিশ্বাসও নেই।

৫. ঈশ্বরটিশ্বর নিয়ে অত ভাবনাচিন্তার সময় নেই। গুরুদেব যা বলেছেন সেটাই ঠিক।

গুরুদেব নির্বাচনের ব্যাপারেও মধ্যবিত্তদের মধ্যে শ্রেণিভেদ আছে। যারা শ্রীশ্রীমা মানে, অরবিন্দ আশ্রমের শিষ্য, তাঁরা হলেন সবচেয়ে এলিট। এরপরই রামকৃষ্ণ মিশন। শ্রীশ্রী ওঁকারনাথ, মোহনানন্দ এরপর শ্রীশ্রীঅনুকুল ঠাকুরের এবং শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ ঠাকুরের শিষ্যরাও আছেন। এঁদের অনেকেরই আলাদা আলাদা জীবনচর্যা আছে। আলাদা রকমের 'জপ' আছে, আলাদা ধরনের ভজন সংগীত আছে। শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারীর শিষ্যরা আবার আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কিছুটা বীর রস মিশিয়েছেন। ওরা ভাবেন বালক ব্রহ্মচারী এবং নেতাজী দুজনই বেঁচে আছেন

এবং জাতিকে উদ্ধার করবেন।

তত্ত্বগতভাবে অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্ম ছাড়া সৃষ্টিটার সবই মায়া ভেবেছেন। যা দেখি তার কিছুই নেই। দ্বৈতবাদীরা সৃষ্টি ও ঈশ্বর দুটোই স্বীকার করেছেন। আবার আচার্য্য শংকর ব্রহ্মসূত্রে বলেছেন দেহ অতিরিক্ত চৈতন্য বলে কিছু নেই। দেহ প্রত্যঙ্গ হলে চৈতন্য প্রতক্ষ হয়, আবার দেহ না থাকলে চৈতন্যও থাকে না। সুতরাং চৈতন্য দেহেরই ধর্ম।

লোকায়ত দার্শনিকরা আবার এই কথাই বলেন। ফুলের গন্ধের মত চৈতন্য দেহের ধর্ম। চৈতন্য আলাদা কিছু নয়। কিন্তু শংকর ভাষ্যকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন পন্ডিতরা ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন চৈতন্য মানে মন। মনই আত্মা। কেউ বলছেন শরীর শেষ হলে চৈতন্য থাকে না, সুতরাং চৈতন্যই আত্মা। আবার আত্মা মেশে পরমাত্মায়। সুতরাং পরমাত্মাই ঈশ্বর। আবার চৈতন্যই ঈশ্বর এরকমও বলা হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।

আবার রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ উপন্যাসের জগমোহন যুক্তি সাজাচ্ছেন—

ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে আমার এই বুদ্ধি ঈশ্বরেরই দান। সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে, ঈশ্বর নাই অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে ঈশ্বর নাই।

এই ঈশ্বর যদি থাকেন, তাঁকে পাওয়ার পথ কী? পাওয়া মানেটাই বা কী? উপলব্ধি করা, নাকি তাঁর আশীর্বাদ পাওয়া, নাকি তাঁর শক্তির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করা? এরও কি কোন উত্তর আছে? কেউ বলেন কৃষ্ণ নামেই মুক্তি। কেউ বলেন প্রার্থনায় মুক্তি। কেউ বলেন কলিকালে কেবল নামজপ, আর কিছু নয়। কেউ অব্যার ভাবেন কুলকুন্ডলিনীর সাধনাতেই মুক্তি। মুক্তি মানে কী? পুনর্জন্ম রোধ? প্রার্থনায় কিছু হয়না—এরকম কথা পাই অক্ষয়কুমারে। দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থনার বাড়াবাড়িকে বিদ্রুপ করতেন অক্ষয় কুমার দত্ত। উনি বলছেন শষ্য উৎপাদনের জন্য দরকার পরিশ্রম।

সুতরাং পরিশ্রম = শষ্য।

পরিশ্রম + প্রার্থনা = একই পরিমান শষ্য।

সুতরাং প্রার্থনা = শূন্য।

এদিকে অরবিন্দ বলছেন ধ্যান করতে। ধ্যানেই চৈতন্য বিকাশ। বলছেন পরমসত্য হলেন সচ্চিদানন্দ। এই জগৎ তাঁরই অভিব্যক্তি। এ জীবন থেকেই ক্রমশ চৈতন্যের বিকাশ ও ব্যাপ্তি ঘটবে। চৈতন্যবিকাশের জন্য দরকার ধ্যান।

আবার স্বরূপানন্দ বলছেন কেবল কৃষ্ণনাম। মতুয়ারা বলছেন ঢোল বাজিয়ে নাচো। আর রামকৃষ্ণ কাউকে বিমুখ করলেন না। বললেন যত মত তত পথ। সব গন্ডোগোল মিটে যায় এই আপ্তবাক্যটি বিশ্বাস করতে পারলে। বাঙালি মধ্যবিত্ত কি এই আপ্তবাক্যটাও মেনে নিতে পারলো? তাহলে তো ধনতন্ত্রও পথ, গণতন্ত্রও

পথ, জনগণতন্ত্রও পথ। সুকুমার রায়ের এই দুনিয়ার সকল ভালো গোছের ব্যাপার হয়ে যায়। কালীও ভালো, কৃষ্ণও ভালো। জ্যোতিও ভালো মমতাও ভালো। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বোধহয় মেনেই নিল। তাই কৃষ্ণ ও কালীকে মিলিয়ে কৃষ্ণকালী বিগ্রহ বানানো। বৈষ্ণব বাড়িতে দুর্গাপূজাও হল, কিন্তু পাঁঠাবলির পরিবর্তে চালকুমড়ো বলি। এ্যালোপ্যাথি ওষুধের সঙ্গে হোমিওপ্যাথিও একটু। মেলাতে চায়, কিন্তু জিজ্ঞাসাও ছাড়ে না।

জন্মান্তর বা পুনর্জন্ম আছে? একটা আত্মার পরিবর্তে একটা দেহ। তাহলে লোকসংখ্যা বাড়ে কি করে? একটা মানুষের আত্মাই অন্য মানুষের দেহে যাবে এমন নয় যদি যুক্তি দেখাই তবে তো অন্য যুক্তি হল দেহ মানে কোটি কোটি কোষ। প্রতিটি কোষ একটা করে প্রাণসত্ত্বা। আবার এ্যামিবাও প্রাণী, হাতিও প্রাণী। এ্যামিবার আত্মা কি হাতির দেহে ঢুকতে পারে? উত্তর নেই। আবার এটাও দেখলাম, স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পরে' বইয়ের যাবতীয় ব্লাফ বাঙালি মেনে নিয়েছে।

মৃত্যুর পর কী হয়? এই প্রশ্ন নচিকেতা জিজ্ঞাসা করেছিল স্বয়ং যমকেই। যম প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে গেলেন। উত্তর দিলেন না। স্বর্গ-নরক ধারণা বেদে নেই। স্বর্গের আরাম আর নরকের যন্ত্রণা সেমেটিক ধারণা। আমি ছোটবেলায় একটা মিষ্টির দোকানের বাঁধানো ছবিতে নরক যন্ত্রণা দেখে বেশ আমোদ পেতাম। মিথ্যা কথার শাস্তিতে জিভ কেটে দেয়া হচ্ছে, কুলটা রমণীর শাস্তিতে স্তন কেটে নেয়া হচ্ছে...। বিদ্যাসাগরও নরকের শাস্তি নিয়ে খুব রসিকতা করতেন এবং এই রসিকতা অবিশ্বাস থেকেই এসেছিল।

মৃত্যুর পর যদি পুনর্জন্মই হবে তবে স্বর্গবাস নরকবাসের প্রশ্ন ওঠে না। দুটো কি করে একসঙ্গে ঘটে? শ্রাদ্ধকর্ম নিয়েও মহা ঝামেলা। গীতাতে বলা হল আত্মা এমন জিনিস যা আগুনে পোড়ে না, জলে ভেজে না, অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করা যায় না...। আত্মা হল ক্ষুধা তৃষ্ণার অতীত।

তবে কেন ঐ আত্মাকে পিন্ড খাওয়ানো? কেন জল দান? কেন বস্ত্র দান? এর উত্তরে বলা হয় মৃত্যুর পর আত্মার একটা সূক্ষ্ম শরীর থাকে। তখন তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে। পিন্ড দেবার পর আর সূক্ষ্ম শরীর থাকে না। কিন্তু শ্রাদ্ধে বলা হয় অমুক গোত্রস্য প্রেতঃ...প্রেত বলা হচ্ছে বারবার। বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বলে একটা ব্যাপার হয়। যদি পুনর্জন্মই হয়ে থাকে কিম্বা ধরা যাক ঐ আত্মা মুক্ত হয়ে পরমাত্মায় লীন হয়ে গেছে—তবে বছর বছর শ্রাদ্ধ করে কাকে পিন্ডি খাওয়াই আমরা?

আবার প্ল্যানচেটেও বিশ্বাস আছে অনেকের। কাকে প্ল্যানচেট? যদি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি, তবে সেই আরাধ্য এতদিনে ঘোড়া-গাধা-ভালুক কী হয়েছে জানিনা। অথচ প্ল্যানচেট করি। প্ল্যানচেটে ২০/৩০/৪০ বছর আগেকার মৃত আত্মারা আসেন।

এরকম নানা প্রশ্ন আসে। প্রশ্নগুলি জট পাকায়। জট খোলার একটাই মন্ত্র যত মত তত পথ। এই মন্ত্রে আমরা একইসঙ্গে পুনর্জন্ম, স্বর্গ-নরক, প্ল্যানচেট, শ্রাদ্ধশান্তি সবই মেনে নিতে পারি।

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার? এই প্রশ্ন অনেক দিনের। ব্রাহ্মরা মূর্তিপুজোর বিরোধীতা করে প্রার্থনা ভিত্তিক একেশ্বরবাদ প্রচার করলেন। মুসলিমরাও একেশ্বরবাদী। একজন বাঙালি মুসলিম লেখককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সত্যি করে বলতো ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? উনি বলেছিলেন কোন ধারণাই নেই। কিন্তু আমি পয়গম্বরকে শ্রদ্ধা করি।

জিজ্ঞাসা করলাম—কোরানকে ঈশ্বরিক বাণী মানো?

উনি বললেন—মানতে তো হয়, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে আল্লা তো নিরাকার, কিন্তু কোরানের কথাগুলি বললেন কি করে? কথা বলতে তো কণ্ঠ লাগে, গলা লাগে, জিহ্বা লাগে। নিরাকার হলে উনি কথা বলবেন কি করে, আর সেই বাণী ফেরেস্তা মারফৎ পয়গম্বরের কাছে পৌঁছাবেন কি করে? বেহেস্তে একটা আরস আছে। ওটা খোদার সিংহাসন। শরীর না থাকলে সিংহাসনে বসবেন কি করে বুঝিনা। তবে এসব প্রশ্ন শহরের মধ্যবিত্তদের মধ্যে করলে বিপদ নেই, কিন্তু আমার গ্রামের লোকজনকে এসব প্রশ্নটশ্ন করা যাবে না। আপনাদের হিন্দুধর্মে অনেক সুবিধা আছে। কোন লিখিত নির্দেশ নাই। ইমাম সাহেব নাই, ফতোয়া নাই, জুম্বাবারের বক্তৃতা নাই। আপনারা মূর্তিপূজক হতে পারেন, কিন্তু ঐসব মূর্তি নিয়ে রঙ্গরসিকতাও কম করেন না। একবার তো দেখলাম অসুরের মুখ হয়ে গেল ইয়াহিয়া খান। আর দেবদেবীদের কতটা শ্রদ্ধাভক্তি করেন সন্দেহ আছে। কৃষ্ণকে নিয়ে কম ইয়ারকি ফাজলামি আপনাদের? নারদ তো ক্লাউন। শিব তো গাঁজাখোর। ভারী আশ্চর্য লাগে কোন দেবত্ব না থাকা সত্ত্বেও এরা দেবতা। এটাই ইউনিক লাগে। আর সত্যি কথাটা কি জানেন, ইসলামী মিথগুলি আমাদের যতটা নিজের মনে হয়, তার চেয়ে বেশি একাত্মতা বোধ করি হিন্দু মিথোলজিতে। কিন্তু কথাটা আপনার আর আমার মধ্যেই থাকা ভালো।

সত্যিই বলেছিলেন উনি। আমাদের পালা কীর্তনে কৃষ্ণকে নিয়ে আমরা কী না করেছি। যে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। প্রফেটের চাইতেও বেশি। ভগবান নিদ্রা গিয়েছিল গোলযোগ সইতে পারেন না-র মত গান লিখেছি আমরা। নরক গুলজারের মত নাটক হয়েছে, যমালয়ে জীবন্ত মানুষের মত সিনেমা হয়েছে। আমাদের এত দেবতা। সব হিসেব রাখতে পারি না। এর মধ্যে কালীকে একটু বেশি পাত্তা দেয়া হয়, কিছুটা ভয়ে। আমি কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে কয়েকজনের কাছে গিয়েছিলাম। সবাই মধ্যবিত্তই। স্কুল শিক্ষক বা শিক্ষিকা, সরকারি কর্মচারি, দোকানদার, হোমিও ডাক্তার ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১ : ঈশ্বর আছেন?

পনেরজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সরাসরি না বলেছেন তিনজন।

প্রশ্ন ২ : ঈশ্বর এক না বহু?

একজন বলেছেন ঈশ্বর এক। সেটা হল শক্তি। প্রকৃতির ঘনীভূত শক্তি। ছজন বলেছেন ঈশ্বর এক হয়েও বহুরকম রূপ পরিগ্রহ করেন। তিনজন বলেছেন ঈশ্বর এক, কিন্তু আমরা বহুভাবে দেখতে চাই। কখনো বন্ধু ভাবে বা প্রেমিক ভাবে যেমন রাধা দেখেছিলেন। কখনো মা ভাবে, কখনো সন্তান রূপে। যেমন আমরা নাড়ুগোপালকে দেখি।

দুজন বলেছেন জানিনা ভাই, এতসব নিয়ে ভাবিনা। কালীমন্দির দেখলে প্রণাম ঠুকে দিই। কেউ প্রসাদ দিলে খেয়ে নিই, নির্মাল্য দিলে মাথায় ঠেকাই, ব্যাস, আর কিছু জানিনা। বাকিরা বলেছেন ভগবান নানা ভাবে বিরাজ করেন, মূর্তিতেও থাকেন। মন্ত্রের একটা শক্তি আছে। পুরোহিতরা মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। সেটা মিছিমিছি নয়।

প্রশ্ন তিন : স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস আছে?

আটজন বলেছেন স্বর্গনরক কিছু নেই। চারজন বলেছেন পাপ করলে এই জন্মেই বিচার হয়ে যায়, নরকে যাবার দরকার নেই। তিনজন বলেছেন স্বর্গ নরক আছে।

প্রশ্ন চার : পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত বা গঙ্গাস্নানে পাপ মুক্তি হয়?

তেরজনই বলেছেন গঙ্গাস্নানে পাপ মুক্তি হয় না। প্রায়শ্চিত্তেও হয় না। কিন্তু প্রয়াগে বা হরিদ্বারে গেলে গঙ্গাস্নান করে নিই। ক্ষতি তো কিছু নেই। ভালই লাগে। একজন বলেছেন অনুশোচনাই পাপ মুক্তির পথ। ভালো কাজ করলেও পাপ কেটে যায়। মাত্র একজনই বলেছেন গঙ্গাস্নানে পাপ মুক্তি হয়। প্রসঙ্গত বলি, গঙ্গাসাগরে বা প্রয়াগে যারা স্নান করতে যান, তাঁদের মধ্যে মধ্যবিত্ত নগণ্য।

প্রশ্ন পাঁচ : তাবিজ মাদুলি, পাথরে বিশ্বাস করেন?

সাতজন বলেছেন বিশ্বাস করি না। চারজন বলেছেন বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছুই নেই। তবে কোন জ্যোতিষী যদি বলেন পাথরে কাজ হবে, তখন ভাবি পরেই দেখি না, ক্ষতি তো কিছু নেই, কিছু পয়সা যাবে, আর তো কিছু নয়। কত পয়সা কত ভাবেই তো যায়। চারজন বলেছেন নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি। দ্রব্যগুণ বলেতো কিছু আছে। পাথর, মানে রত্ন খুব সায়েন্টিফিক। সূর্য্য থেকে কসমিক রে টেনে নেয়।

প্রশ্ন ছয় : ঠাকুর দেবতার কাছে মানসিক করেন?

ছজন বলেছেন করি না। দেবতাদের ঘুষ দিতে যাব কেন? ছজন বলেছেন প্রার্থনা করি, কিন্তু মানুষ তো, প্রার্থনার সময় কিন্তু চেয়েও ফেলি। যেমন ছেলেদের

ক্যারিয়ার যেন ভালো হয়, আমার ডায়বিটিস কমিয়ে দাও। বাকিরা বলেছেন ডাকার মত ডাকতে পারলে ঠাকুর শোনেন। আর মানসিক করা মানে কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করা। একটা সিম্বলের মতন আর কি।

প্রবন্ধটার আয়তন বেড়ে যাচ্ছে। এবার থামবো। এ পর্যন্ত লিখে মনে হল আমাদের মধ্যবিত্তের (বিশেষত হিন্দু) ধর্মবোধ বড় বিচিত্র। চ্যানেলে চ্যানেলে জ্যোতিষীদের রমরমা। সবাই ডিজাইনারের পোষাক পরে চিত্রিত হয়ে বিচিত্র কথা বলছেন। যজ্ঞ, মন্ত্র, পারদের শিব, স্ত্রী যন্ত্রম—কত কি। আমরা এসব কিনছি। সব সময় যে খুব বিশ্বাস করেই কিনছি তাও নয়।

গত কয়েক বছর ধরে দেখছি তরুণ ছেলে মেয়েদের কব্জিতে লাল সুতো জড়ানো। সৌরভ গাঙ্গুলি এই সুতো জড়িয়ে থাকেন। তাঁদের পারিবারিক মঙ্গলচন্ডীর সুতো। সৌরভ তরুণদের কাছে আইডল। ওর অনুকরণেই হয়তো, অনেকেই সুতো জড়াতে শুরু করেছে। এটা এখন ফ্যাশন পর্যায়ে চলে গেছে। লাল সুতোর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তখন ব্যোম কালী, ফিরিঙ্গি কালী, লেক কালী বাড়িতেও লাল সুতো পাওয়া যাচ্ছে।

একটি টাইট জিন্‌স ও গেঞ্জি পরা মোবাইল করধৃতা সদ্য যুবতীর হাতে লাল সুতো দেখে প্রশ্ন করেছিলাম—ওটা কোথায় পেলে? বলেছিল বয়ফ্রেন্ড পরিয়ে দিয়েছে। বলেছিল এটা অস্‌পিসাস্‌। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—বিশ্বাস কর? বলেছিল—দিস ইজ বিয়ন্ড বিলিফ অর ডিসবিলিফ। আই মাস্ট অনার দ্য সেন্টিমেন্ট অফ মাই বয়ফ্রেন্ড।

কব্জির সুতোর কথা যখন উঠলোই, তাহলে আর একটা মজার ঘটনা বলেই শেষ করব। আমি একটি যুবককে জানি, শহরতলির। ওদের একটি পারিবারিক কালীমন্দির আছে। যুবকটি সিপিএম করতো। ওর বাবা ওকে অনেক করে বলেছিলেন কালীপুজোটা শিখে নিতে। ভাল হবে। বিজেপি আসছে (১০/১৫ বছর আগেকার কথা বলছি) সিপিএম ছেড়ে দিতেও বলতেন। ছেলেটির যুক্তি ছিল সিপিএম-এর সঙ্গে কালীর কোন দ্বন্দ্ব নেই। কালীরও সব লাল, সিপিএম এরও সব লাল।

সম্প্রতি ছেলেটি তৃণমূল হয়েছে। ছেলেটি চাকরি বাকরি, কন্ট্রাক্টারি কিছুই পায়নি, কালীমন্দিরটাই করে। ওর হাতে দেখি সবুজ সুতোর ডোর। জিজ্ঞাসা করি তৃণমূলের সব সবুজ, কিন্তু কালী কি করে তৃণমূল হবে? ওঁর তো সবই লাল। তুমি তো সবুজ জবা পাবে না। কিন্তু ডোরের সুতো কি করে সবুজ করলে? ছেলেটি বলল—সবুজ করে দিলাম, অসুবিধে কী? এখানে এখন প্রচুর তৃণমূলের ছেলে। তৃণমূলের লালে এ্যালার্জি আছে।

বি শে ষ প্র ব ন্ধ

নারী নিগ্রহের নানা রকম

কৃষ্ণা বসু

এই পৃথিবীতে আদি রাজনীতি হল লিঙ্গ-রাজনীতি। প্রকৃতির নিয়মে মানব-সমাজ নারী-পুরুষে বিভাজিত। প্রাকৃতিক ভারসাম্যে একশত নরনারীর মধ্যে পঞ্চাশজন নারী ও পঞ্চাশজন পুরুষ—এই নিয়মে মানব জীবন চলেছে প্রবাহিত হয়ে। কিন্তু লিঙ্গ-রাজনীতির এই সমাজে কন্যাভ্রুণ হত্যা হয় লক্ষ লক্ষ, শিশুকন্যা হত্যা হয় লক্ষ লক্ষ, পণের জন্য বধূহত্যা হয় লক্ষ লক্ষ—নারী পুরুষের ভারসাম্যে পঞ্চাশ পঞ্চাশ না হয়ে, প্রতি পঞ্চাশজন পুরুষে আজ দাঁড়িয়েছে বিয়াল্লিশজন নারী—এই নারী-হত্যার, নারীমেধযজ্ঞের যে সভ্যতা তৈরি হয়েছে, তা যেমন ভাবে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, তেমনই ভাবে তা মানবতার বিরোধীও বটে। নিষ্ঠুর এই সভ্যতায় বহু মেয়েকে বাঁচতেই দেওয়া হয় না, নারী নিধনকারী এই সমাজকে কীভাবে ক্ষমা করব আমরা?

আমাদের সমাজে এবং ভারতের বাইরেও মেয়েদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় নানাভাবে। নানাভাবে উৎপীড়ন অপমান যেমন করা হয়, তেমনই বহু মেয়েকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলা হয়। আর যাকে মেরে ফেলা হয়না, ধর্ষিতা সেই মেয়ে কোনো সামাজিক সম্মান বা মর্যাদা পায়না কোনোভাবেই। সেই কন্যার আর জীবন-সঙ্গী জোটে না, বিবাহ হতে চায়না, বিনা অপরাধে সেই কন্যাটি সারা জীবন বিপন্না ও অপরাধিনী হয়ে থাকে। যদি মানবিক বিচারকোণ থেকে, যদি যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনা করি তাহলে একথা বলে দেবার দরকার হয়না যে,—সামগ্রিক সমাজের এই মেয়েদের প্রতি ইতর, নিষ্ঠুর, অমানবিক ব্যবহারের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করা এখনি দরকার।

আজও অসংখ্য মেয়েকে বিবাহ দেওয়া হয় পণ দিয়ে। পাত্রপক্ষ একটি সুস্থ সবল সুশ্রী মেয়েকে তাদের পুত্রের জীবনসঙ্গিনী হিসাবে পাচ্ছে এইটাই তো বিরাট বড় পাওয়া। তাদের ভাবী বংশধরের মাকে পাচ্ছে এটাও কম কথা নয়,—কিন্তু এইসব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রীপক্ষের গলায় গামছা দিয়ে পণ-এর টাকা, আসবাবপত্র, গয়নাগাটি আদায় করা হয়। বিয়ে হয়ে যাবার পরও এইসব আদায়পত্রের জন্য কন্যাটির উপর নানারকম নির্যতন চলতেই থাকে বহু সময়, এর ফলে অনেক সময় কন্যাটি আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, নয়তো তাকে মৃত্যুর

দিকে ঠেলে দেয় তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা। সামগ্রিক পরিবেশটিই মেয়েদের বেঁচে থাকার পক্ষে, মেয়েদের বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর। এই সত্যটিকে আজ উপলব্ধি করবার সময় এসেছে, এবং একথাও আমাদের বুঝতে হবে যে যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব ভয়ঙ্কর সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে হবে, সুস্থ সামাজিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলন করতে হবে, সকল মানুষের মধ্যে সচেতনতা প্রসারের জন্য প্রয়াসী হতেই হবে।

সমাজ জীবনের দিকে মুক্ত মনে তাকালে, সত্যবদ্ধ দৃষ্টিতে দেখলে আরো বহু সত্য ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। যে শ্রম এই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়, গার্হস্থ্য শ্রমকে তার মধ্যে ধরলে দেখা যাবে, প্রায় ৬৫ শতাংশ শ্রম মেয়েরাই করে, গৃহে গৃহে যত শ্রম সৃষ্টি হয়, তার কোনো সম্মান দক্ষিণা বা মজুরি বা পারিশ্রমিক মাপা হয় না। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে এবং রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত একজন গৃহিণী বা গৃহবধূ যে শ্রম উৎপাদন করে, তার কোনো অর্থমূল্য সমাজে প্রচলিত নেই। তার কাজের তার শ্রমের কোনো আর্থিক স্বীকৃতি নেই বলেই কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত একবার লিখেছিলেন, ‘‘গৃহশ্রমে মজুরি হয়না বলে মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে?’’ গৃহশ্রমের আর্থিক স্বীকৃতি না দেওয়া যে এক ধরনের ধারাবাহিক প্রবঞ্চনা,—এই সত্যটিকে সহজ সুস্থ মনে মেনে নিতে হবে এবং এর জন্য ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন করতেই হবে।

এই যে বিপুল সংখ্যক কন্যাভ্রূণ হত্যা করা হয়, তার কারণটিকে অনুসন্ধান করতে হবে। কন্যাগুলিকে যে মাতৃগর্ভেই মেরে ফেলা হয়, তার মূল কারণ কিন্তু অর্থনৈতিক। এই কন্যাগুলি বেঁচে থাকলে তাদের বিশাল অঙ্কের পণ দিয়ে বিয়ে দিতে হবে, সেই সম্ভাবনার কথা ভেবেই সেই কন্যাভ্রূণগুলিকে মেরে ফেলা হয়। যদি এই সচেতনতার বিস্তার করা যায় যে, কন্যারা জন্মালে, লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ালে পরিবার পরিজনের অর্থনৈতিক অবলম্বন হয়ে উঠতে পারবে তারা, তারা বোঝা না হয়ে নিজেরাই সম্পদ হয়ে উঠতে পারবে, তাহলে কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধ হবে এবং কন্যাদের জীবনও যে মূল্যবান এই সত্যটি উপলব্ধ হয়ে উঠবে। যেদিন থেকে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বন্ধ করে দেওয়া হল, মেয়েদের পরগাছার, পর-নির্ভরতার জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হল, সেই সময় থেকেই তার যাবতীয় অপমানের সূচনা হল। আর অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরতার অভাবই তাকে সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে তুলল। তাই যুক্তিবাদী হয়ে, বাস্তব-সম্মত দৃষ্টিতে এইসব সমস্যার কারণগুলিকে দেখতে এবং সমাধান করতে প্রয়াসী হতে হবে। মেয়েদের অর্থনৈতিক সম্মানজনক স্বনির্ভরতার সত্যটিকে যদি সমাজে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে কন্যাভ্রূণ হত্যা, শিশুকন্যা হত্যা বন্ধ করা যাবে। যখন জানা যাবে কন্যারা সম্মানজনক উপার্জনের বড় সহায় হয়ে

উঠবে তখন কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধ হবে, হবেই।

আমরা মাতৃ-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করি, আমাদের বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হল দুর্গাপূজা। দেবীপূজার এই পরম্পরা আমাদের সংস্কৃতির একটি জরুরী ও মূল বিষয়—অথচ মাতৃপূজারী এই জাতি মাতৃজাতিকেই সবচেয়ে অবজ্ঞা, অবহেলা, অপমান করে যায়। প্রবাদে, প্রবচনে লোককথায় সর্বত্র এই অপমানের চিহ্ন বর্তমান, আসুন পাঠক, আসুন পাঠিকা আমাদের কিছু প্রবাদ-প্রবচনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি,—

(১) 'মেয়ের নাম ফেলি, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি।'

(২) 'পুড়ল মেয়ে উড়ল ছাই, তবে মেয়ের গুন গাই।'

(৩) 'লাজে বউ ভাত খায়না—চাল্‌তা হেন গ্রাস।'

(৪) 'দরবারে না মুখ পাই, ঘরে এসে বউ ঠেঙাই।'

(৫) 'বউ জব্দ কিলে, হলুদ জব্দ শিলে।'

এইরকম অজস্র প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে সমাজ-মানসে নারীর অপমানিত অবস্থানটিই ধরা পড়ে যায়। এই যে স্ববিরোধে ভরা আমাদের সমাজ, মাতৃশক্তির পূজা করে, আবার মাতৃজাতিকেই প্রতি-পদক্ষেপে হেয় করে, অপমান করে—এই স্ববিরোধ থেকে বাইরে নিয়ে মুক্ত করতে হবে সমাজ-মানসকে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভুল শিক্ষা, পৌরুষ-বিস্ফারের অহংকার, মেয়েদের সামগ্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে পরনির্ভরশীল থাকার নির্ম্মম ব্যবস্থা—এসবের চারিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে এবং অনুভব করতে হবে এবং এই অপমানিত অবস্থান থেকে মেয়েদের বাইরে বার করে এনে মাথা উঁচু করে বাঁচবার নীতি ও রীতি শেখাতে হবে।

আজকের পৃথিবীতে মেয়েরা ছেলেদের মতোই শিক্ষায়, দীক্ষায়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সবেতে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে। দক্ষতায় মেয়েরা যে ছেলেদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয় তা আমরা বারে বারে দেখেছি। তবুও মেয়েদের নানাভাবে হেনস্থা করা হয়, হেয় করা হয়। বহুক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও তাদের অবজ্ঞা করা হয়। এই সুপরিকল্পিত ভাবে খাটো করা, ছোট করার ইতরতাকে চিনে নিতে হবে এবং নির্বিকার ও অবিচলিত থাকতে হবে।

গৃহগত-শ্রম মেয়েদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ পরিবারে বাধ্যতামূলক, যেসব মেয়েরা বাহির পৃথিবীতে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত তারাও বাইরের কাজ সারার সঙ্গে সঙ্গে ঘর সংসারের কাজ করতে বাধ্য থাকে। এইসব ঘর ও বাহির সামলানো মেয়েরা সত্যিই দশভূজার এক একটি অংশ বিশেষ; কিন্তু ঘর ও বাহির একইসঙ্গে সামলাতে গিয়ে এসব মেয়েদের ক্ষেত্রে অপরিসীম চাপ পড়ে। এই চাপ তারা বহন করতে বাধ্য থাকে, তার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের পুরুষেরা

গৃহগত শ্রম করতে চায় না। সংবেদনশীল ও দরদী মানুষকে আজ বুঝতেই হবে যে শ্রম-ক্ষমতার একটা সীমা থাকে, মেয়েদের এই দুই দিক সামলানো শ্রম-ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে আধুনিক নাগরিক জীবনে, এটা উদ্বেগের এবং আশঙ্কার বিষয়ও বটে।

এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত মেয়েদের পুড়িয়ে মেরে ফেলা হত জোর করে—নাম দেওয়া হত সতীদাহ বা সহমরণ। বিধবা মেয়েদের সারাজীবন বঞ্চনার শিকার হতে হত, আজ আইন করে সতীদাহ বন্ধ হয়েছে, বিধবাবিবাহ প্রচলন হয়েছে, কিন্তু অন্য নানাভাবে নারীনিগ্রহ বন্ধ হয়নি এতটুকুও। নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসাবেও দেখা হয় এই পণ্য-সংস্কৃতির যুগে। বিজ্ঞাপনে বিপণনে যেভাবে নারী শরীরকে ব্যবহার করা হয়, যেভাবে নারীজাতিকে অপমান করা হয় আজকের এই বেনিয়া সভ্যতায়—তার বিষয়েও সকল নারী-পুরুষকে সচেতন হতে হবে। প্রতিটি নারীকে স্বনির্ভর হতে হবে এবং তা সম্মানজনক পথে। যার যেমন যোগ্যতা তাকে সেই কাজ করতেই হবে, চারিপাশে মেয়েদের স্বনির্ভরতা প্রকল্পে অনেক সংগঠন অনেক কাজ করছেন, তারা গ্রামেগঞ্জে বহু মেয়ের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার কাজে সাহায্য করছেন, তাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সহযোগ ও সমর্থন থাকা দরকার।

এখনো এই সমাজে হাজার হাজার মেয়েকে নারী পাচার চক্র তুলে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। সেইসব মেয়ের দেহ ব্যবসায়িনী হওয়া ছাড়া, শরীর বিক্রয় করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকেনা বাঁচবার। দরিদ্র পরিবারের বাবা মায়েরা অনেক সময় ভয়ানক দারিদ্র্যের চাপ সহ্য করতে না পেরে কন্যাসন্তানদের বিক্রি করে দেয় দালালদের হাতে। সেইসব মেয়ের জীবনের পরিণামের কথা ভাবলে কষ্টে দুঃখে বাক্‌রোধ হয়ে আসে। সভ্য, শিক্ষিত, আলোক-প্রাপ্ত সমাজ এই ভয়ঙ্কর সত্যের দিকে সেভাবে ফিরে তাকান না—প্রতিদিন শত শত নিরপরাধ দরিদ্র অসহায় কন্যা নারী-পাচার চক্রের চক্রান্তে পড়ে চালান হয়ে যাচ্ছে ভয়ানক পরিণামের দিকে। কেন আমাদের সমাজ এই সত্যের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকবে? কেন?

১৯৯৯ সালে হায়দ্রাবাদে এক আন্তর্জাতিক লেখিকা-সমাবেশে গিয়েছিলাম আমন্ত্রিত হয়ে, সেখানে অন্য প্রদেশের, অন্য দেশের লেখিকাদের সঙ্গে আলাপ হল। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই মেয়েদের অবস্থান বেদনাদায়ক, দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের জীবন তাদের। জাপানী লেখিকারা বললেন যে, সেখানে একই যোগ্যতা সম্পন্ন দুইজন ইঞ্জিনিয়র—একজন পুরুষ, অন্যজন নারী, নারীটি পুরুষটির চেয়ে বেসরকারি সংগঠনে কম বেতনে চাকরি করতে বাধ্য থাকেন। নারীপুরুষের পারিশ্রমিক সমান সমান নয় বহুক্ষেত্রে সেদেশে। জাপানের মতো আধুনিক উন্নত

দেশে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমাদের দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রে মেয়েরা যে বেতনে, স্বীকৃতিতে বঞ্চিত হবে, এ আর নতুন কথা কি? এক ভোরবেলা বিধাননগর স্টেশনে উত্তরবঙ্গ থেকে আগত এক ট্রেন থেকে নেমে দেখি, স্টেশনের কাছে চায়ের দোকানের সামনে বহু শ্রমজীবিনী নারী বসে আছে, তারা বসে আছে রাজমিস্ত্রির কাজ পাবে বলে। তাদের সঙ্গে চা খেতে খেতে আলাপচারিতায় জানলাম তারা একই শ্রম করেও পুরুষ রাজমিস্ত্রিদের চেয়ে কম মজুরি পায়। তাছাড়া তাদের নিয়োগকর্তা রাজমিস্ত্রিদের মনোরঞ্জন করতে হয় কখনো কখনো। সর্বত্র এই অসহায় অবস্থান একক প্রয়াসে সমাধান হবে না। এর জন্য সমস্ত মেয়েদের সচেতন ও সংঘবদ্ধ হতে হবে, সংবেদনশীল, হৃদয়বান পুরুষদের পাশে থাকতে হবে। এগুলি দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন, হঠাৎ করে কিছু হবে না। দীর্ঘদিনের সংগ্রামে, সচেতন লড়াই-এ এইসব কুৎসিত নিদারুণ নিষ্ঠুর অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে হবে। একদিনে কিছু হবে না। দরকার ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা, আন্দোলন, প্রতিবাদ এবং সংগঠিত থাকা।

ডাইনি

পুরুলিয়ার ঝালদা ব্লকের বাঘবেন্দায় ৭০ বছরের কলামণি মাঝি নামে এক মহিলাকে ডাইনি বলে কুপিয়ে হত্যা করা হয়, ৫ অক্টোবর ২০০৯। খবর পেয়ে **পুরুলিয়া যুক্তিবাদী সমিতির শাখার মধুসূদন মাহাত** ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় দু'দিনের মধ্যে। স্থানীয় মানুষদের নিয়ে হাজির হয় ঝালদা থানায়। ঝালদা থানা প্রথমে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে স্থানীয় ছেলেদের পরে অবশ্য যুক্তিবাদী সমিতির নামে এবং বর্ধমান থেকে সেক্রেটারি সঞ্জয় কর্মকারের ফোন পেয়ে কেস চালু করে দেয় পুলিশ।

কৃষ্ণভক্ত ও.সি.-র চেষ্টায় ভাতারে বন্ধ হল বলিপ্রথা

পুজোর শেষে মা-কালীর হাতে গীতা ধরিয়ে দিলেন ও.সি. কৃষ্ণভক্ত মাধব মন্ডল। তাঁর প্রচেষ্টাতেই বলিদান প্রথা বন্ধ হয়ে গেল ভাতার থানা গ্রামরক্ষী বাহিনী কমিটির কালীপুজোয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস দীর্ঘদিনের প্রথা ভাঙলেও কোন অমঙ্গল হবে না। প্রশংসা জানিয়েছে যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক সঞ্জয় কর্মকার।

সংবাদ ১৯ অক্টোবর ২০০৯

বি শে ষ প্র ব ন্ধ

বুড়ো হওয়া

সুমিত্রা

সুন্দরভাবে বুড়ো হওয়াটা একটা আর্ট। আমরা সবাই প্রতিমুহূর্তে বড় হচ্ছি—তারপর বুড়ো হচ্ছি। আরও হব। কিন্তু এই সত্যি কথাটাকে উদারতার সঙ্গে মেনে নেওয়া খুব সহজ নয়। তাই এটাকে রপ্ত করতে হয়। যে কোনও শিল্পের মতই ধৈর্য্য ধরে শিখতে হয়।

আমি অসুস্থ, শয্যাশায়ী, অতিবৃদ্ধদের কথা বলছি না। এই সময়টা সম্বন্ধে আমরা আগে থেকে কিছু বলতে পারি না। আমরা যারা 'স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার'কে জোর গলায় তুলে ধরেছি, আমরাও বলতে পারি না, শেষ পর্যন্ত আমাদের 'স্ব-ইচ্ছা'টা কতটা গুরুত্ব বা সুযোগ বা অনুমোদন পাবে। সেই ভয়ঙ্কর 'শেষের সে দিন'-এর কথা আপাতত থাক। আমি বলতে চাই তার আগের অবস্থাটার কথা, যখন আমরা আমাদের জীবনের ক্ষমতা-প্রতিভার তুঙ্গ থেকে পড়তির দিকে। সেটা শারীরিক বা মানসিক বা দুটোই হতে পারে। সত্যি বলতে কি, শারীরিক অবস্থা আমাদের মনকে এতটাই প্রভাবিত করে যে আমাদের কর্মক্ষমতা, অ্যাটিচিউড, প্রতিভা, জনপ্রিয়তা সবকিছুকেই আমূল পাল্টে দিতে পারে।

আমরা অল্পবয়সীদের মধ্যে সাধারণভাবে যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো দেখি, সেগুলো প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মত সব ক্ষেত্রে মিলে যায়। একটা পিকনিক পার্টির ছেলেদের দেখলে মোটামুটি তাদের হাব ভাব, প্রাণোচ্ছলতা, লাফাঝাঁপি কথাবার্তা—একই ধরনের লাগে। আন্দাজে প্রায় প্রত্যেকেরই বয়স বলে দেওয়া যায়, আঠারো কি পঁচিশ প্রায় নিখুঁত মিলিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু পঞ্চাশ থেকে সত্তর, এই বয়েসটা খুব গোলমেলে। কি নারী, কি পুরুষ, চট করে এদের বয়স বোঝা যায় না। একজন পঁয়ষট্টিতেও টানটান, হুল্লোড়ে, হাসিখুশি—তো আরেকজন বাহান্নতেই 'আর তো পারি না!' এর একটা রহস্য নিশ্চয়ই আছে!

ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ পর্যন্ত আমরা যারা মোটামুটিভাবে কর্মক্ষম, নারী বা পুরুষ, নিজেদের প্রতিভার বা ক্ষমতার তুঙ্গে থাকি। চেহারায় চটক নাই বা থাকল। চুলে পাক দেখাই যাক, কি ঢাকাই পড়ুক মেহেন্দি-কলপে—তাতে কিছু এসে যায় না। আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে না। মেয়েদের বাসে, বাজারে দিদি বা বৌদির বদলে মাসিমা, কাকিমাটাও মন্দ লাগে না। প্রণাম-ট্রণামও পাওয়া যায় ঘন ঘন।

সভা-সমিতিতে খাতির জোটে। লজ্জা পাওয়া বা 'লোকে কী বলবে?'—এই চিন্তাটা কমে যায় বলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মন খুলে ঝগড়াও করা যায়। বাসে-ট্রামে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা হ'ল, রাস্তায় দোকানে কোনও গোলমাল, অকারণে কোনও নিরীহ লোককে সবাই মিলে খ্যাপাচ্ছে—ব্যস্, আগ বাড়িয়ে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া যায়। লোকে শোনেও। চতুর্দশী কন্যাটি অবশ্য লজ্জায় পড়ে। "মা যে কী কর না! তোমার কী দরকার এসব ঝামেলায় যাবার?" আমি কিন্তু এনজয় করি। পাকা চুল আর মোটা চশমায় ভারিক্কি চেহারাটার অ্যাডভান্টেজ নিয়ে নিই।

এই সময়টায় পুরুষরাও একটু শৌখিন হয়ে পড়ে। রংচঙে জামা, ব্যায়াম-জগিং করে শরীর ঠিক রাখা—মহিলারা পার্লারে গিয়ে গ্রুমিং করানো—এক কথায় নিজেকে আরেকটু সুন্দর আর ফিট্ রাখার চেষ্টা। যারা করেন না, তাদেরও মনে হয় করাই উচিৎ।

কিন্তু এর পর? যখন দেখবো আমি চেঁচালেও লোকে পাত্তা দিচ্ছে না, বেশি কথা বললে, আড়ালে হাসাহাসি করছে! একটা কাজ করতে গিয়ে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ভুলে মেরে দিচ্ছি। তখন নিজে টের পাবো তো পরিবর্তনটা? টের পেয়ে সচেতন না হ'লে সমূহ বিপদ।

আর তারও পর যখন দেখব আমার কোনও কাজই নেই? আমি কিচ্ছু না করলেও চলে। সংসারের সবকিছু ঠিকমত চলছে। ছেলেমেয়েরা নিজেরাই সব সামলে নিচ্ছে কি ঘরে, কি কাজের জায়গায়। আমি সারাদিনে একটা কথা না বল্লেও আমার বাড়ির লোক কিছু অভাববোধ করছে না। অর্থাৎ আমি না থাকলেও কিছু এসে যাচ্ছে না—কোথাও, কারুরই কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। তখন? পারবো তো মাথা ঠান্ডা রাখতে?

আমি এই অবস্থাটার কথা বলছিলাম। এই সময়ে সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার—সেটা শারীরিক সুস্থতা। নিজের শরীরের অবস্থা নিজে বুঝে, সেইমত কাজ চালিয়ে নেওয়া। ওষুধ, পথ্যি, পছন্দের খাওয়া, উপযুক্ত বিশ্রাম ও ব্যায়াম—এগুলো স্বনির্ভরভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

ধরে নিলাম এই আদর্শ অবস্থাটা আয়ত্ত করা গেল। তারপরও থাকে মানসিক সুস্থতার ব্যাপারটা।

কেস স্টাডি :

নানা ধরনের বয়স্কদের আমরা দেখি—ঘিটখিটে, বদমেজাজী, বেশি কথা-বলা, অকারণে জ্ঞান দেওয়া, বড় বড় কথা বলা আত্মম্ভরী, প্যানপ্যানে, শরীর নিয়ে খুঁতখুঁতে, পিটপিটে শুচিবায়ুগ্রস্ত, খামখেয়ালি।—আজ বকবক তো কাল গোমড়া—এরকম বহু বয়স্ক মানুষ (স্ত্রীলিঙ্গ বা পুং) আমরা অহরহই দেখে থাকি।

সবচেয়ে শর্টকাটে ও ইন্টারেস্টিং কায়দায় আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এইসব বুড়ো-বুড়ীদের ভাল করে নিরীক্ষণ করা। তাদের চরিত্র বা অভ্যাসগুলো চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করা। তাহলেই আমরা এই দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধির বিষয়ে অনেকটা ওয়াকিবহাল হতে পারবো, আর বয়েসকালে ঐ সুন্দর সুন্দর বিশেষণগুলোকে এড়িয়ে বুড়ো হতে পারবো।

আমরা যখন স্কুলে, পাড়ায় এক বৃদ্ধ ছিলেন, যাঁকে বড়রা খুব খাতির করতো। রিটায়ার্ড আই.এ.এস.। খুব পন্ডিত ছিলেন, এক সময় অবশ্যই উচ্চপদে ছিলেন। রাশভারী, দু ছেলে, বৌ, নাতিদের নিয়ে বড় সংসার, পাড়ার সব অনুষ্ঠানে প্রথম সারিতে। দেখলেই ধরে জ্ঞান দিতেন। একতরফা বকবক। আমাদের কিছু জিজ্ঞেসও করতেন না। শুধুই উপদেশ। ভীষণ অহঙ্কারী ভাব। আরও বুড়ো হলেন। লাঠি নিয়ে হাঁটতেন। পঁচাত্তর পেরিয়ে গেল। তখনও রাস্তায় হাঁটতেন নিয়মিত। লোক দেখলেই ডাকতেন। কেউ রাস্তা পেরিয়ে এগিয়েও আসত না ওঁর দিকে। কাজ আছে, তাই হাত নেড়ে, ঘাড় নেড়ে মৃদু কুশল প্রশ্ন করেই সবাই কেটে পড়ত। বুঝতাম ওর ঐ জ্ঞানের, পান্ডিত্যের, উচ্চপদের অহঙ্কার ওঁকে এতটাই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে যে সাধারণ অল্পবয়সীরা কেউই আর ওঁর সঙ্গ পছন্দই করছে না।

অনেক বাবাদের দেখেছি, বরাবর সংসারে কর্তৃত্ব করার পর ছেলের সংসারের একজন সদস্যমাত্র হয়ে থাকাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। ছেলের খরচে সংসার চলছে, ছেলেই সব বড় বড় ব্যাপারে ডিসিশান নিচ্ছে, উনি নিজে কিছু বলতে পারছেন না—এই বাস্তব চিত্রটা কিছুতেই হজম করতে পারছেন না। মনে মনে গুমরে রয়েছেন। নিজেকে অপাংক্তেয়, অবহেলিত মনে করছেন। এটা মধ্যবিত্ত পরিবারের একটা সাধারণ চিত্র। কিন্তু এটাও একরকম অক্ষমতা। মানিয়ে নিতে না পারা অক্ষমতা। নিজেরই তো ছেলে। না হয় সে কিছু ব্যাপারে কর্তৃত্ব করছেই। তাতে দুঃখ পাওয়ার কী আছে? ছেলে বেরোজগেরে হলে কি ভাল হত? বরং খুঁটিনাটি খরচা, টাকার হিসেব—এসব ছেড়ে দিলেই তো হয়। সেই সময়টা আড্ডা দিয়ে, ঘুরে বেড়িয়ে, টি.ভি. দেখে—অর্থাৎ যা ভাল লাগে তাই করে কাটালেই তো হয়। অবসর তো অবসরই। সংসার থেকেও এক সময়ে অবসর নিতে হয়। সংসারের ঝুট ঝামেলা এড়িয়ে—নিজের পছন্দের কাজ নিয়ে মেতে থাকার চেষ্টা করলে, কেউ আমাকে পাত্তা দিল কি দিল না, কেউ আমার আর্থিক নির্ভরতা নিয়ে খোঁটা দিতে চেষ্টা করল কি না, তাতে কিছু এসে যাবে না। মেজাজটাই আসল রাজা। হাসিখুশি, খোশগল্প করার মত মেজাজ থাকলে পাড়ার অনেক কাজে অংশগ্রহণ করা যায়। বাড়িটা ছেড়ে, অন্যান্য বন্ধু তৈরি করে নেওয়া যায়। সভা-সমিতিতে যোগও দেওয়া যায়। মনের জানলাটা খুলে যাবে।

নিজেকে নিয়ে মজা করা, আর বাইরের আঘাতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মনের

আনন্দে নিজের কাজ করে যাওয়া—এটা শিখতে হয় খুশবন্ত সিংহের কাছে। গভীর পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, সামাজিক অবস্থান কোনকিছুই ওঁকে স্পর্শ করে না। নিজেকে নিয়ে মজা করাটাকে একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। কটু ভাষায় বিখ্যাত জনকে সমালোচনা করতে ছাড়েননি। কিন্তু কখনও গোমড়ামুখো হননি। ঘৃণা পোষণ করেননি।

বৃদ্ধ হয়েও সরস মনকে সতেজ রাখতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথও। তাঁর সূক্ষ্ম, মার্জিত রসবোধ নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতে ছাড়েনি। একবার নিজেকে তুলনা করেছিলেন প্রায় খালি হয়ে যাওয়া কুঁজোর সঙ্গে—যেটাকে অনেকটা না ঝোঁকালে জল বেরোয় না। চেয়ারে বসে টেবিলে অনেকটাই ঝুঁকে পড়ে লিখতেন বৃদ্ধ বয়সে। শুভার্থীরা বারণ করতেন।

এক হেডমাস্টার ছিলেন। কথা বলতে, চিঠি লিখতে ভালবাসতেন। চিঠি পেতেও। প্রিয় ভাইঝি খুব চিঠি লিখত তাঁকে। কিন্তু মুশকিল হ'ল, রিটায়ার করার পর, সেই দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধিকাল এলো। চিঠি পেলেই লাল দাগ দিয়ে সংশোধন করতেন—বানান ভুল, ভাষার ভুল। তারপর দেখা হলেই ভাইঝিকে ধরে বসিয়ে বোঝাতেন কোথায় কোথায় কী কী ভুল। ষোলো বছরের ভাইঝিটির অত বুড়োর মনস্তত্ব বোঝার বয়স বা ধৈর্য নেই। চিঠি লেখাই বন্ধ করে দিল। লাভ হলনা কিছু। দূরত্ব তৈরি হল।

আসলে এই পাগলামিগুলো কোনওটাই ইচ্ছাকৃত নয়। বলা যায়—বয়ঃসন্ধির ভারসাম্যহীনতা বা আন্দাজের ভুল। তাই আমি যদি নিজেকে অপরপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে চাই, নিজেকেও শোধরাবো।

আমার শাশুড়ি ছিলেন—৭৮-এ মারা গেলেন। কিন্তু ৫৮ থেকেই তিনি বৃদ্ধা। 'কেমন আছো?' জিজ্ঞেস করলে কোনওদিন বলেননি 'ভাল'। শুরু করতেন—পেটের সমস্যা, হাঁটুতে ব্যথা, ... ইত্যাদি দিয়ে। আসলে একাকীত্বে ভুগতেন। বাড়ির যাবতীয় কাজ—রান্না, ঝাঁট-পাট, পুজো আর্চ্চা—কিছুই বাদ দিতেন না। স্বল্প আয়ে ছ' ছ'টি ছেলেমেয়ে মানুষ করেছেন এক সময়। ঘরের কাজে বেশ পটু। ক্লান্ত। কিন্তু বাড়ির বাইরে এক পাও বেরোতেন না। মানুষের সঙ্গে মিশতেন না। প্রতিবেশি বা আত্মীয় কেউই ওঁদের বাড়ি আসতেন না। উনি নিজের কাজ স্বাধীনভাবে করতেন। বিপদে-আপদে আমরা যেতাম, সবই ঠিক কথা। কিন্তু সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটা খারাপ দিক থাকেই। সেটাকে অতিক্রম করতে পারেননি। একটা তিক্ততা, বিতৃষ্ণা গ্রাস করে থাকতো সবসময়।

আমাদের অনেকের মধ্যেই এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো অল্পবিস্তর দেখা দিতে পারে। কিন্তু সেটা বুঝতে পারলে তবেই নিজেকে সংশোধন করা যায়, বা নিজেকে নিয়ে মজা করা যায়। নিজের অক্ষমতা বা অপারগতাগুলো যেমন বেশি সিরিয়াসলি

নেব না, তেমনই সেগুলোকে অগ্রাহ্য করে 'আমিই সব সময় ঠিক, বাকিরা সব ভুল করছে, নয়ত খারাপ' সেটা ভাবাও ভারসাম্যহীনতারই লক্ষণ।

একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। এক বন্ধুর পিসি—বয়েস পঞ্চান্ন, গৃহবধূ। হঠাৎ বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে হাজির দিদির বাড়ি। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন। ডিভোর্স করতে চান বুড়ো পিসেকে। কী ব্যাপার? সবাই তো তাজ্জব। পিসেমশাই ভাল চাকরি করতেন। কোন সমস্যাই নেই, সুখী দম্পতি। এটাই সবাই জানতো। পিসির বক্তব্য—''রিটায়ার করে সারাক্ষণ বাড়িতে থাকে। টিক্‌টিক্‌ করে সব ব্যাপারে। আমি কী কী করছি তার সবকিছু নিয়েই অযথা মাথা ঘামায়, ভুল ধরে। এমনকি রান্নাঘরেও ঢুকে পড়ে। আমার অসহ্য লাগছে। এতদিন কোথায় ছিল এই মাথাব্যথা? সকালে ব্রেকফাস্ট মুখে গুঁজে বেরিয়ে গেছে। ফিরেছে রাত করে। সবই তো আমি সামলেছি। বাড়ির যাবতীয় কাজ, মিস্তিরি খাটানো থেকে রিপেয়ার, বিল জমা দেওয়া, বাজার করা। ছেলেদের দেখা আর রান্নাবান্না না হয় ছেড়েই দিলাম। এতদিন কী ভাবে চলেছে কখনও তো জানতে চাননি! আমি আর এনার সঙ্গে থাকতে পারছি না। একা থাকব সেও ভী আচ্ছা।''

সবাই প্রথমে হতবাক। তারপর হাসাহাসি। শেষ পর্যন্ত পিসেমশাইকে বোঝানো হ'ল। একজন সফল, ব্যস্ত মানুষ হঠাৎ বেকার হয়ে গেছেন, সবে চার মাস হ'ল। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। কর্তৃত্ব করা নেশাটাও ছাড়তে পারছেন না। আরে মশাই কর্তৃত্ব করুন নিজের ফিল্ডে। ঘরে কেন? অফিস-বাড়ি করতে করতে অবসর-যাপনের জন্য কোনও নেশা বা ভাললাগার মত 'শখ' তৈরিই হয়নি। এখন তাই হঠাৎ ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছেন, আর অতিষ্ঠ করে তুলছেন এতকালের পুরনো, বিশ্বস্ত গৃহিণীটিকেও। গিন্নীরও জমে থাকা ক্ষোভ, অভিমান বিস্ফোরিত হয়েছে হঠাৎ! যাই হোক—শেষ পর্যন্ত মিটমাট একটা হয়েছিল। কী ভাবে জানি না। বইপড়া, বেড়ানো, পার্ট-টাইম কাজ, আড্ডা না কি পাড়ার লাফিং ক্লাব—কে বাড়িয়ে দিয়েছিল সাহায্যের হাত, মনে নেই। তবে যাই হোক, পিসিটিকে প্রশংসা না করে উপায় নেই। মুখ বুজে পীড়িতা স্ত্রী হয়ে বসে না থেকে প্রতিবাদ করাতেই সঠিক রাস্তা বেরোল।

এই ঘটনাটা খুঁটিয়ে দেখার ও লেখার কারণ অবসরের পরে পুরুষদের এই সমস্যাটা ভীষণ কমন। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত প্রৌঢ়াদের মধ্যে এই সময়টা সুন্দর কাটে যদি তাঁরা গুছিয়ে সংসার করতে পারেন। সংসারে তাঁদের প্রয়োজনটা কোনওদিন কমে না। তুলনায় বাড়িতে বসে যাওয়া প্রৌঢ়রা অনেকটা দিশেহারা হয়ে পড়েন। একদা চাকুরিরতা মহিলারা—যারা ততটা সংসারী ছিলেন না, তাঁরা অনেকটা অবসর পেয়ে যান হঠাৎ। এই সময়টা ধর্ম-কর্ম বা গুরু ধরার বাতিক না হলে, নিদেনপক্ষে রবিশঙ্করের আর্ট অফ লিভিং কিম্বা রামদেবের চক্করে না পড়লে নিজেদের শখ—

ছোটখাট ব্যবসা, বাগান করা, পড়ানো, পড়া ও লেখা ইত্যাদি সবকিছুই মাঝবয়স পেরোনো মহিলাদের যথেষ্ট আনন্দ ও তৃপ্তি দিতে পারে। নিজেদের 'আর্ট অফ লিভিং' বা বেঁচে থাকার শিল্পকলা নিজেরাই তৈরি করে নেওয়া যায়। খেয়াল রাখতে হবে ছেলে-বৌ-এর সংসারে অযথা নাক না গলানোর বিষয়টা।

মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে এই সময়টা উচিৎ গৃহবন্দী হয়ে না থাকা। বিভিন্ন বয়সের মানুষের সঙ্গে মেশাটা যেমন জরুরী, তেমনই নিজেদের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়াটাও খুবই স্বাস্থ্যকর।

পুরনো বন্ধুদের সাথে আড্ডা : নতুন বন্ধু করা

ছোটবেলার, স্কুল-কলেজের বন্ধুদের সঙ্গটা একটা উত্তেজক, আনন্দের বিষয় হয় সাধারণত। যারা আমাদের সেই পুরনো টগবগে সময়টায় চিনতো, তাদের সঙ্গটা পুরনো হয় না কখনই। যতই বুড়ো হই, তাদের কাছে আমি চিরতরুণ। আমাদের আড্ডার বিষয়গুলোও হয় অন্যরকম। জীবনের মধ্যস্থলে এসে আমাদের অনেকেরই রুচি ও চিন্তাভাবনা, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক মতামত অনেক পাল্টে যেতেই পারে। যায়ও। তবু পুরনো বন্ধুদের আড্ডায় এই বিষয়গুলো অতটা অসুবিধা করে না। হয় আমরা সযত্নে এড়িয়ে যাই সেন্সিটিভ ইস্যু, নয়ত খেলাচ্ছলেই ঝগড়া-তর্ক চলে। মোটকথা পুরনো বন্ধুদের সঙ্গ আমাদের গোমড়ামুখো বদরাগী বুড়ো বা খিটমিটে আত্মম্ভরী বুড়ীর চেহারাগুলো কিছুক্ষণের জন্য হলেও বদলে দেয়।

এই ব্যাপারটা কিন্তু হয়না পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে। আমি লক্ষ্য করেছি সকালে 'মর্ণিং ওয়াকের' প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া-দের। তাদের আলোচনার বিষয়গুলো সংসারের নানান অশান্তি ঘিরে। কারুর বৌ জাঁদরেল, কারুর কাজের লোকের সমস্যা। আর শরীর নিয়ে অভিযোগ তো আছেই। তার সঙ্গে খুব সূক্ষ্মভাবে চলে নিজেদের পান্ডিত্য বা আর্থিক সচ্ছলতার ব্যাপারটা জাহির করার চেষ্টা। এর একটা কারণও থাকে। আমরা যাদের সঙ্গে মধ্যবয়স পেরিয়ে গিয়ে পরিচিত হয়েছি—তারা অনেকেই আমার সবটা জানে না—আমি ছোটবেলায় পড়াশোনার ভাল ছিলাম কি না, ভাল ফুটবল খেলতাম কি না, ছবি আঁকা বা গানে প্রাইজ পেতাম কি না। মোট কথা আমার বাইরের চেহারার ভেতরে যে আসল 'আমি'—সেটাকে চেনে না যারা, তাদের কাছে নিজেদের তুলে ধরতেই আমরা এত কথা বলি। এর থেকে অবশ্য কিছু কিছু স্থায়ী বন্ধুত্বও তৈরি হয়।

একটি মানুষকে চিনতে ন্যূনতম একটা সময় লাগে। একটু কথাবার্তা, ইন্টার-অ্যাকশান না করেই তার সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়াটা তার প্রতি অবিচার। তাই একটু ধৈর্য ধরে অপর পক্ষের মনের ভাবটা ধরা, বক্তব্যটা শোনা জরুরী।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটু অধৈর্য্য হয়ে পড়ি। একটু চেষ্টা করলে আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলোকে কন্ট্রোল করে অনেক সুন্দর থাকতে পারি।

আমরা আসলে ভুলেই যাই যে আমরা খুব বেশিদিন বাঁচি না। আর মাত্র একশো বছর পরে আমি কেন, আমার আদরের ছেলেমেয়েরাও এই ধরাধামে থামবে না। তাই যতদিন আছি, ততদিন আনন্দ করে থাকাটা জরুরী। সবাইকে আনন্দ দিতে সবসময়ে না পারলেও অকারণে কষ্ট যেন না দিই। সমাজবদলের চেষ্টা, লড়াই, বিপ্লব—সেসব তো পৃথিবীটাকে সুন্দর করার লক্ষ্যেই। লড়াইটাকে এনজয় করি বলে তো নয়! তাহলে তো লড়াই-ই চালিয়ে যেতে হয় চিরকাল। লড়াইয়ের শেষটাই তো লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। নিজের ভেতরে বাইরে সবরকমের লড়াই। তাই নিজেকে ভালবাসা, নিজেকে ভাল রাখাটা খুব দরকার। একটা ব্যালেন্স রাখা—সমাজে ও সংসারে নিজের অবস্থানটা বুঝে নেওয়া দরকার। এই ব্যালেন্সটা না এলেই হয় মুশকিল। আগের মত আর পারি না, আগের মত আর সুন্দরী নেই, ক্ষমতা চলে গেল অন্য একজন জুনিয়ারের হাতে, আগের মত আর জনপ্রিয়তা পাচ্ছিনা, আগের মত খেলতে পারি না, লিখতে পারি না, গাইতে পারি না, অভিনয় করতে পারি না, বক্তৃতা দিতে পারি না, নতুন কিছু শিখতে পারি না—এই অক্ষমতাগুলোই আমাদের অস্থির, অতৃপ্ত করে তোলে।

জেনারেশন গ্যাপ কমাতে

আধুনিক সমাজে জেনারেশান গ্যাপটা অনেক বড়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-বিনোদন—সব এত দ্রুত পাল্টাচ্ছে যে এই প্রজন্মের সঙ্গে আগের প্রজন্মের রুচি ও অবসর বিনোদনের উপকরণগুলো অনেক আলাদা হতে বাধ্য। আমাদের ছোটবেলায় একটা দেবব্রত বিশ্বাসের লং-প্লেয়িং রেকর্ড কিনলে আমরা বাড়িসুদ্ধ ছোট-বড় সবাই উপভোগ করতাম। রুচিটা একইরকম ছিল—প্রায়। আর এখন আমার ভাইপো গিটারে কী বাজায়—তার মাথামুন্ডু বুঝি না। নিজেকে ব্যাকডেটেড মনে হয়। এটাতে বিরক্ত বলে চলবে না, তাহলেই বুড়ো হয়ে যাব। বরং একটু বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। তাই এই বয়সে নতুন কিছু শেখার চেষ্টা জীবনে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। কম্পিউটার শেখা, গান-বাজনা বা ভাষা শেখা—কোনওটাই ষাট পেরোনোর পরে অসম্ভব নয়। আমার এক মেসোমশাই, জাহাজে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন—অসম্ভব গান ভালবাসতেন, কিন্তু শিখতে শুরু করলেন পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছে। রীতিমত স্বরলিপি দেখে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান তুলতেন—মাসির কাছে শিখে। এই নতুন কিছু শেখার মজাটা খুব উদ্দীপ্ত করে মস্তিষ্ককে। অপর্ণা সেনের মত অনেক প্রতিভাশালী, ক্রিয়েটিভ মানুষ তাই বুড়ো হন না কখনও। একটা আমেরিকান ছোটগল্প পড়েছিলাম—তাতে নায়ক 'ইয়াং ম্যান অ্যাক্সেলব্রড'

এক বৃদ্ধ নিরক্ষর চাষী। ছোটবয়সে পড়াশোনা করার সময় পাননি। তাই বৃদ্ধ বয়সে ছেলেদের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন এবং চালিয়ে গেলেন—পৌঁছে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। তখনও তিনি 'ইয়াং ম্যান'। হায়, আমাদের দেশে এই সুযোগটা পাওয়া মুশকিল। তবু অনেকেই লেখাপড়া, গবেষণা চালিয়ে যান অনির্দিষ্টকাল ধরে। এবং তাতেই খুশি থাকেন।

এই নতুন কিছু শেখার কথা বললে অনেকেরই দেখেছি প্রতিক্রিয়া হয়—'কীই হবে?' নয়ত—'সময় কোথায়'? আসলে ইচ্ছেটাই নেই। আমরা ধরেই নিই যতকিছু শেখা-পড়া সবই জীবিকা বা অর্থোপার্জনের জন্যে। তাই জীবনকে উপভোগ করতে পারি না। এই ধারণাটা ছোটবেলাতেই চাপিয়ে দেওয়া হয়। বাচ্চারা দেখেছি ক্রিকেট খেলতে 'কিট' ঘাড়ে ক্লাবে যায় বড় হয়ে সৌরভ হওয়ার আশায়। মা-বাবা পাঠান তাই যায়। অনেকেই খেলার আনন্দে যায়না। এই ভুলটা আর করবেন না। কিচ্ছু না হলেও, শুধু আনন্দের জন্যই কাজ করুন, খেলুন। আর সময়? দিনের অনেকটা সময়ই কি আমরা অপচয় করি না? দেখুন তো—সারাদিনে অনেকটা সময়ই এমন কিছু কাজ করি যেগুলো না করলেও হয়। অভ্যাসবশতঃ করি। যেমন আমরা রান্না-খাওয়াতে অনেক সময় নষ্ট করি। অনেক বেশি সময় ধরে রান্না করি যেটা না করলেও চলে। টাকা-পয়সার হিসেব করেন অযথা বয়স্করা—যেটা খানিকটা মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে যায়। সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে যত কম মাথা ঘামানো যায়, ততই ভাল।

বিখ্যাত, প্রতিভাশালী—আমরা যাদের জিনিয়াস বলি—তাদের বেশি বয়সটাতে অনেক অস্বাভাবিকতা দেখা যেতে পারে। জিনিয়াসরা এমনিতেই একটু পাগলাটে হতে পারেন। এখানে পাগলামি বলতে মনোবিকার বোঝাচ্ছি না। এটাকে বলা যায় 'এক্সেনট্রিসিটি'—অস্বাভাবিকতা। এর একটা কারণ—'জিনিয়াস'রা লোকে কী ভাবলো নিয়ে মাথা ঘামান না। যা মনে হয় তাই বলেন বা করেন, তাই সেটা সামাজিক মাপকাঠিতে অদ্ভুত ঠেকতেই পারে। এটা বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদদের মধ্যে দেখা যায়। এই ব্যাপারটা বয়স হলে আরও বেড়ে যেতে পারে। অর্থাৎ কারুর ভাল লাগুক বা না লাগুক, আমার কিছু এসে যায় না। অতএব সামাজিক ব্যাপারটা যেমন খুশি, ভদ্রতা না মেনেও করা যায়। এটা সচেতনভাবে না করলেও, অনেক সময়ে হয়েই যায়। মনে করুন শতায়ু নীরদ সি. চৌধুরির কথা।

এই ব্যাপারটা খুব বেশি বেড়ে গেলে সামাজিক মর্যাদা বা জনপ্রিয়তাকে খর্ব করবেই। আর তার জন্যেই, বিখ্যাত, প্রতিষ্ঠিত, সফল মানুষদেরও নিজেদের বয়েসকালের বাড়াবাড়িগুলোতে রাশ পরানোর চেষ্টা করা উচিত। তার পাশাপাশি তাঁর নিকটজনেরও উচিত তাঁদের অবস্থাটা সহানুভূতির সঙ্গে দেখা।

জীবনের সায়াহ্নে এসে যদি আমরা নিজেদের সারাজীবনের সম্পদ—আমাদের

সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, আদর্শ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই, যদি চাই আরও বেশি সফলভাবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে বাস্তব রূপ দিতে, আরও শ্রদ্ধা, আরও ভালবাসা কুড়িয়ে নিতে—তাহলে নিজেদের প্রৌঢ়ত্ব ও আসন্ন বার্ধক্যকে উপভোগ করতে হবে। নয়ত, এই সময়টাতে ভারসাম্য হারালে একটা বিশাল অপচয় হয়ে যাবে। বেঁচে থাকার, কাজ করার উদ্দেশ্যটাই দিগভ্রষ্ট হয়ে অকালে নষ্ট হবে।

'বুড়ো বয়সে ভীমরতি' একটা প্রচলিত কথা। আমরা হাসাহাসি করি বটে এ নিয়ে, কিন্তু আমাদের মত যারা প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায়—তারা ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা করলে পারি।

মাও-সে-তুং থেকে আরও অনেকেরই শেষজীবনটা সুন্দর হয়নি। আবার রবীন্দ্রনাথের মত অনেকেই বয়সকালে পরিপক্ক ফলের মত নিটোল, পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদে উত্তরণ তো শেষ দশটা বছরেই—৭০ থেকে ৮০তে পেলাম। তখনও তিনি স্থিতধী, পরিণত, সম্পূর্ণ একটি ব্যক্তিত্ব। তখনও তিনি শিখতে ও পাল্টাতে প্রস্তুত ছিলেন। এটা খুব দুর্লভ। বিখ্যাত, প্রতিভাবানদের মধ্যেও দুর্লভ।

*   *   *

আসলে এই **ভাল থাকার রেসিপি**গুলো —মুখে বলা বা লেখা যত সোজা, কাজে প্রয়োগ করা ততটা নয়। তার কারণ—এতক্ষণ যেটা বলিনি—সেটা হচ্ছে এই পরিবর্তনটা অনেকটাই বায়োলজিকাল। অর্থাৎ কৈশোরে বয়ঃসন্ধিকালে যেমন হরমোনের কার্যকলাপের ফলে শরীরে-মনে কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়—যার সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবেশ ও বাড়িতে বাবা-মায়ের অ্যাটিচ্যুড, ঠিক তেমনটিই ঘটে আরেকবার মধ্যবয়সে পৌঁছে—এটা দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধি। বৃদ্ধবয়সটাকে তাই দ্বিতীয় শৈশব বলে।

মেয়েদের মেনোপজের সমস্যার বিষয়ে এখন শিক্ষিত সমাজ সবাই জানে। একসময়ে যে বয়সে মেয়েদের পাগলামি দেখা দিত, স্বভাব খিটখিটে হয়ে যেত, কাউকে ভূতে ধরত, নানারকম বাতিক দেখা যেত, তারপর কেউ কেউ ডাইনী আখ্যা পেত—তার সঙ্গে যুক্ত হত একাকীত্ব, অবহেলা, সমাজের অত্যাচার; এখন আমরা অনেকেই জানি এরকম কিছু কিছু ব্যাপার এই শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত। একটুতে ধৈর্য্য হারানো, অভিমান করা, একটুতেই নিজেকে অবহেলিত বা অবজ্ঞার পাত্র মনে করা, অল্পেতেই চোখে জল এসে যাওয়া, মানসিক অবসাদ, বেঁচে থাকতে অনীহা ইত্যাদি ৪৫ থেকেই মেয়েদের শুরু হতে পারে। এটা জানা থাকলে অনেকটা নিজেকে চিনতে সুবিধা হয়। এখনকার শিক্ষিত মহিলারা তাই নিজেকে ভাল রাখতে সচেতনভাবে চেষ্টা চালান। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে হরমোন থেরাপি (HRT বা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি) চালান।

এতদিন সবজান্তা পুরুষরা ভেবেছিল এটা শুধু মেয়েদেরই সমস্যা। 'মেনোপজ'

একটা নিতান্ত মেয়েলি ব্যাপার। তারা নিজেরা থাকবে চিরকাল বুদ্ধিদীপ্ত, আত্মবিশ্বাসী, আমৃত্যু যৌনক্ষমতাসম্পন্ন চিরতরুণ। এইভাবে বহু পুরুষ তাদের অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়াকে জাস্টিফাই করে এসেছে এতকাল। এই নিয়ে রিসার্চ হয়েছে—কিন্তু ফলাফল চাপা পড়ে গেছে, প্রকাশ হয়নি। আসলে পুরুষেরও হরমোনাল ভারসাম্য ব্যাহত হয় বয়েসকালে। ৪০ এই শুরু হতে পারে কারুর কারুর। ৬০ থেকে ৭০ এর মধ্যে সাধারণত 'টেস্টোস্টেরন' নামক হরমোন তার ভারসাম্য হারায়। এটাও থেরাপিযোগ্য অর্থাৎ চিকিৎসায় সারানো যায়। প্রায় দেড়শো বছর আগে প্রথম এক জার্মান বিজ্ঞানী এই পুং হরমোনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তারপর ১৯৪৪-এ আমেরিকান ডাক্তার কার্ল হেলার ও গর্ডন মায়ার্স পুরুষের মেনোপজ, যার নাম 'অ্যান্ড্রোপজ', তাকে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তারপরও ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি পুরুষশাসিত সমাজ। মহিলাদের সন্তানধারণ ক্ষমতা চলে যায় মধ্যবয়সে এসে, এবং তারপর তারা একটু খ্যাপাটে হয়ে যায়, বুড়ি হয়ে যায় শারীরিক ও মানসিকভাবে—এটাই প্রচলিত ধারণা ছিল। পুরুষদের তেমন কিছু হয় না—এটাই ভাবতে সমাজ অভ্যস্ত ছিল। এখন কিন্তু পাশ্চাত্যে 'মেনোপজ' ও 'অ্যান্ড্রোপজ' সমান গুরুত্ব পায়। শারীরিক ক্ষমতা, পিতৃত্ব—ইত্যাদির জন্য থেরাপিও হয়, যার নাম TRT বা 'টেস্টোস্টেরন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি'। যখন নারীরা HRT করে শারীরিক সৌন্দর্য তথা যৌবনকে ধরে রাখতে শিখল, তখন পুরুষও উঠে পড়ে লাগলো—"আমরাই বা বাদ যাই কেন?" তার আগে পুরুষের বয়সকালের উপসর্গগুলোকে কেবলই প্রৌঢ়ত্বের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করত লোকে। উপসর্গগুলো এইরকম—শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি, শারীরিক দুর্বলতা, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, ঘুম ও খিদে কমে যাওয়া, যৌনক্ষমতা বা ইচ্ছে কমে যাওয়া, তুচ্ছ কারণে রেগে ওঠা, সন্দেহ প্রবণতা—এগুলো কেবলই মানসিক একটা প্রৌঢ়ত্বের সংকট, 'মধ্যবয়সের সঙ্কটকাল' বা 'midlife crisis' বলে ধরা হত। এখন পুরুষও দেহসৌষ্ঠব, খেলাধূলার ক্ষমতা, শারীরিক শক্তি বাড়ানোর জন্য থেরাপি বা চিকিৎসার আশ্রয় নিচ্ছে। খেলোয়াড়দের মধ্যে এটা বিশেষভাবে জনপ্রিয়।

পুরুষদের ক্ষেত্রে অ্যান্ড্রোপজ, মেনোপজের মত স্পষ্ট একটা চিহ্নিত করার মত ঘটনা নয়। পুরুষের ক্রাইসিস শুরু হয় ৪০% ক্ষেত্রে ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে। এটা হয় ধীরে ধীরে অনেকদিন ধরে। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে অন্যান্য অসুস্থতা না থাকলে অর্ধেকের বেশি পুরুষ তার পৌরুষ অটুট রাখতে পারে ৭০ বছর বয়স অবধি।

এখানেই শেষ করি পাশ্চাত্যের গবেষণার কচকচি। এত চুলচেরা বিশ্লেষণে না গিয়ে এটাই আমাদের সমাজের প্রেক্ষিতে মনে করে নেওয়া ভাল যে—আমরা চিরকাল সুন্দর, ঝকঝকে, স্বাস্থ্যবান, প্রতিভার তুঙ্গে থাকব না। একসময় ক্ষমতার শীর্ষ থেকে নেমে আসা অবধারিত। অধোগতি শুরু হবে। হতেই হবে। তাই

মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

আমরা কী কী করতে পারি?

প্রথমত, উপযুক্ত পুষ্টি ও বিশ্রামের জন্য—

- পুষ্টিকর তেলবর্জিত, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া।
- প্রচুর ঘুমানো।
- প্রচুর জল খাওয়া।
- নিয়মিত কোন দু-একরকম ব্যায়াম করা।
- অ্যালকোহল ও ক্যাফিন জাতীয় পানীয় কম খাওয়া।

এতো গেল শরীরের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ। এ ছাড়া মনমেজাজ ভাল রাখার জন্য, টেনশন কমানোর জন্য—

— তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, অপ্রয়োজনীয়, নেতিবাচক বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে রাখুন, উর্দ্ধে রাখুন।

— নতুন কোনও মনের খোরাক—যেমন গান শোনা, নিছক কোন মজার গল্পের বই পড়া, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া—ইত্যাদি অদরকারী কাজ করে কিছুটা অন্তত সময় কাটান। সবসময় দরকারী কাজ না-ই বা করলেন।

— যে সব খবরে টেনশন বাড়ে, যাদের দেখলে বা যাদের সঙ্গে কথা বললে বিরক্তির উদ্রেক হয়, তাদের এড়িয়ে যান। সবাইকে শোধরানো আপনার দায় নয়। অন্তত নিজের মেজাজ খারাপ করে তো নয়ই।

— যেসব কাজ আপনি না করলেও চলে, অন্য কেউ হয়ত আপনার মত করে করবে না, তবুও পারবে, সেগুলো অন্যের হাতে ছেড়ে দিন।

— সংসারের সব কিছু খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আপনি ব্যস্ত না হলেও দেখবেন অনেক কাজ দিব্যি চলবে। শুধু শুধু নাক গলাবেন না।

— পড়াশোনা চালিয়ে যান। সাম্প্রতিক খবর বিষয়ে আপ-টু-ডেট থাকুন।

— মনে রাখবেন, আপনার আশেপাশের লোক খুশি থাকলে তবেই আপনি মানসিক শান্তি পাবেন। অপরকে আনন্দ দেওয়া আপনাকেও আনন্দ দেবে। ভাল ব্যবহারের তাই বিকল্প নেই।

— দিনের ব্যস্ততম সময়ে একবার চোখ বুঁজে ফেলুন। ভাবুন তো, আপনি যা যা করছেন, তা কি সত্যিই জরুরী? এক্ষুনি না করলেই নয়? এক গ্লাস জল খেয়ে চুপচাপ ইজিচেয়ারে বসে একটু জিরিয়ে নিলে কেমন হয়? নিদেনপক্ষে আপনার জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীটির সঙ্গে একটু খোশগল্প করলে?

মন্দ হয় না, তাই না?

আরে মশাই, জীবনটা মোটামুটি সুন্দর। উপভোগ্য।

কত কাজ আছে, আনন্দে করার মত।

কত ঘটনা ঘটছে, উদ্দীপ্ত হওয়ার মত।

কত মানুষ আছে, ভালবাসার মত।

গো আহেড!

বি শে ষ প্র ব ন্ধ

ভারতের প্রকৃত অবস্থান জেনে রাখা ভাল

জয়ব্রত ও অনিমা

আমরা ভারতবাসীরা খুব গর্বের সঙ্গেই বলি "মেরা ভারত মহান"। স্বাধীনতা দিবসে যখন জাতীয় সঙ্গীত বা বন্দেমাতরম্ গাই তখন আমাদের মনে দেশপ্রেম জাগরিত হয়। ভারতীয় হিসাবে আমরা দেশের জন্য গর্বিত হই, কিন্তু আমাদের গর্ব করা কি সত্যি মানায়?

২২শে অক্টোবর, ২০০৮ ভারত সফলভাবে মহাকাশ চন্দ্রযান উৎক্ষেপন করল যেটি পরে চাঁদে জলের অস্তিত্ব প্রমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল। ২২শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এ. আর, রহমান দুটি অস্কার পেলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০০৯ ভারতে একদিনের ক্রিকেট আই.সি.সি. এর তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করল। এইসব খবরগুলি নিয়ে প্রচার-মাধ্যম এবং আমরা খুবই মাতামাতি করি। কিন্তু এটাই কি ভারতের সামগ্রিক চিত্র?

এবার দেখা যাক খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দুর্নীতি প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি যা প্রচার মাধ্যমের আলোয় ততটা আসে না।

দুর্নীতি : ২০০৮-এ ১৭৯টি দেশের মধ্যে দুর্নীতিতে ভারতের অবস্থান ৮৫তম। Transparency International এর রিপোর্ট (২০০৫) অনুযায়ী সরকারি অফিসে কোনো কাজ করানোর জন্য ৫০ শতাংশ ভারতীয়ের ঘুষ দেওয়া অথবা প্রভাবিত করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। ১১টি সাধারণ পরিষেবা যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচারব্যবস্থা, পুলিশ ইত্যাদিতে দুর্নীতির পরিমাণ বছরে প্রায় ২১০৬৮ কোটি টাকা। ২০০৬-এ সুইস ব্যাঙ্কের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী যে পাঁচটি দেশের সবচেয়ে বেশি কালো টাকা জমা আছে ভারত তাদের মধ্যে শীর্ষে। পরিমাণটা এইরকম : ভারত $১৪৫৬ বিলিয়ন, রাশিয়া $৪৭০ বিলিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র $৩৯০ বিলিয়ন, $ইউক্রেন $১০০ বিলিয়ন, চীন $৯৬ বিলিয়ন। ভারতের জমা টাকার ভারতীয় মুদ্রায় পরিমাণ ৭০ লক্ষ কোটি, যা বাকি চারটি দেশের সম্মিলিত টাকার থেকেও অনেক বেশি। বিহারে গরিবের খাদ্যের জন্য দেওয়া সরকারি ভর্তুকির ৮০ শতাংশ চুরি হয়ে যায়। রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। ২০০৭-এ সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে, দেশের ২১টি হাইকোর্টে ৩০ লক্ষ এবং সারা ভারতের বিভিন্ন কোর্টে প্রায় ৩৩ কোটি

১২ লক্ষ মামলার কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। এছাড়াও জাল নোট কান্ড, সরকারি স্ট্যাম্প পেপারে দুর্নীতি, মিগ বিমান কান্ড, বিহারে পশুখাদ্য কেনায় দুর্নীতি, এমনকি সৈন্যদের কফিন কেনায় দুর্নীতি প্রভৃতি প্রতিটি ঘটনা এদেশের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিকেই তুলে ধরে।

দারিদ্র্য : ভারতের দারিদ্র একটি বড় সমস্যা যা ব্যাপক দুর্নীতি ও অসাম্যের সমাজব্যবস্থার হাত ধরেই এসেছে। বিশ্বের মোট দরিদ্রের এক তৃতীয়াংশ ভারতীয়। বিশ্ব ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী ৪২ শতাংশ ভারতীয় আন্তর্জাতিক দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। আন্তর্জাতিক মাপকাঠি অনুযায়ী একজনের আয় দিনপ্রতি ১.২৫ USD (প্রায় ৬০ টাকা এর কম হলে সে দারিদ্রসীমার নিচে এবং ২ USD (প্রায় ৯২ টাকা) এর কম হলে সে দরিদ্র। এই মাপকাঠি অনুযায়ী ভারতের ৮০ শতাংশ মানুষই দরিদ্র। আর ভারতীয় মাপকাঠি অনুসারে জনপ্রতি মাসিক আয় গ্রামে ৩৫৬ টাকা (দিনে ১২ টাকা), শহরে ৫৩৯ টাকা (দিনে ১৮ টাকা) এর বেশি হলে সে দারিদ্রসীমার উর্দ্ধে। ভারতে দারিদ্রহার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি সত্ত্বেও সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২৭.৫ শতাংশ মানুষের দৈনিক গড় আয় ১২ টাকারও কম। NCEUS এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৭৭ শতাংশ ভারতীয় দৈনিক ২০ টাকার কম খরচ করে। ১৯৪৭ সালে কয়েকটি দেশের জনপ্রতি বার্ষিক গড় আয় ছিল এইরূপ— ভারত $৪৩৯, চিন $৬১, দক্ষিণ কোরিয়া $৭৭০, তাইওয়ান $৬৩৬। ১৯৯৯ সালে এই সংখ্যাগুলি হল যথাক্রমে $১৮১৮, $৩২৫৭, $১৩৩১৭, $১৫৭২০। বাকি দেশগুলি অনেক এগিয়ে গেলেও ভারত এদের মধ্যে দরিদ্রতম।

খাদ্য : ভারত কৃষিভিত্তিক দেশ যেখানে ৬০ শতাংশ মানুষই কৃষিনির্ভর। কৃষিজাত পণ্য যেমন ধান, গম, চিনি, বাদাম উৎপাদনে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। এছাড়া দুধ, কাজু, নারকেল, কলা, আম, চা উৎপাদনে ভারত বিশ্বে প্রথম। কিন্তু বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের কৃষি উৎপাদন হারের তুলনায় ভারতের উৎপাদন হার ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ যার প্রধান কারণ কৃষিক্ষেত্রে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহারের অভাব। তা সত্ত্বেও ৩৫ শতাংশ ভারতীয় খাদ্য সংকটে ভোগে। Global hunger index এর মান এদেশে ২৩.৭ যা 'সংকটজনক' এর পর্যায়ভুক্ত। রাষ্ট্রসংঘের রিলিফ এজেন্সির পরিসংখ্যান অনুযায়ী খাদ্যসংকট সূচক অনুসারে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ভারতের অবস্থান ২০তম যা তথাকথিত দুর্বল অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ (২৫তম) এর থেকেও খারাপ। বিশ্বে ভারত খাদ্য সমস্যায় "উচ্চ-সংকট" তালিকাভুক্ত।

স্বাস্থ্য : স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া ভারতের প্রতিটি রাজ্যের সাংবিধানিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে এবং এই প্রস্তাব ১৯৮৩ সালে লোকসভায় গৃহীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ভারতে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। ২০০০-এ দেওয়া

বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যখন হঠাৎ কোনো পরিদর্শন হয় তখন ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রেই ডাক্তার এবং নার্সদের অনুপস্থিতি দেখা যায়। দিল্লির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিশ্ব ব্যাঙ্ক দ্বারা করা সার্ভে অনুযায়ী ৫টি সাধারণ রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসকরা অর্ধেক রোগীকে তার পক্ষে ক্ষতিকর স্বাস্থ্য পরিষেবা দেয়। দেশের রাজধানীর এই অবস্থা হলে ৭০ শতাংশ গ্রামাঞ্চলের কি অবস্থা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারত বিশ্বের সেই চারটি দেশের মধ্যে একটি যেখানে পোলিও এখনও সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়নি। সমগ্র বিশ্বে যত যক্ষ্মা রোগী আছে তার এক তৃতীয়াংশ ভারতীয়। World Health Organisation এর মতে প্রতি বছর দূষিত জল এবং বাতাসের কারণে এদেশে ৯ লক্ষ মানুষ মারা যায়। প্রসব সংক্রান্ত মৃত্যুর হারে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানে। প্রতি ১০০০ জন মানুষের জন্য বিশ্বে হাসপাতাল শয্যার গড় পরিমাণ ৩.৯৬ হলেও ভারতের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা ০.৭ এর থেকে কিছু বেশি।

শিক্ষা : UNESCO এর মতে ভারতে শিক্ষকদের অনুপস্থিতির হার ২৫ শতাংশ যা বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (প্রথম ২৭ শতাংশ)। রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজনীতির দ্বারা শিক্ষক এর নিয়োগ এবং বদলির জন্য এই অনুপস্থিতি এবং নিম্নমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। ভারতে স্বাক্ষরতার হার ৬৬ শতাংশ, পুরুষের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ এবং মহিলার ক্ষেত্রে ৫৪ শতাংশ যা বিশ্বের নির্ধারিত লক্ষ ৭৫ শতাংশ এর থেকে অনেকটাই কম। বিশ্ব ব্যাংক অনুযায়ী ৪০ শতাংশ এরও কম বয়সন্ধিকালের বাচ্চারা মাধ্যমিক স্তরে স্কুলে যায়। ৯০ লক্ষ শিশুর এখনও স্কুলে নাম ওঠেনি। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাখাতে প্রতি বছর গড়ে ৪১৩৭ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু উন্নতি হলেও প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থার জন্য দেশের একটা বড় অংশই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত এবং অতিমাত্রায় কুসংস্কার আচ্ছন্ন।

শিশু ও মহিলা : ভারতে শিশু ও মহিলাদের অবস্থা খুবই খারাপ। এদেশের অর্ধেক শিশুর ওজন নির্ধারিত ওজন অপেক্ষা কম যেটা বিশ্বের সর্বোচ্চের তালিকায় পড়ে। সারা বিশ্বে যত শিশু মারা যায় তার অর্ধেকের বেশি ভারতীয় (বছরে ১ কোটি)। শুধুমাত্র ৪২ শতাংশ শিশুর জন্ম কোনো ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর তত্ত্বাবধানে হয়। ২০০৮-এর UNICEF এর একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৫ বছর বয়সের নিচে বিশ্বে যত শিশুর মৃত্যু হয় তার ২১ শতাংশ (বছরে ২০ লক্ষ) ভারতীয় এবং এ ব্যাপারে ভারত বিশ্বে প্রথম স্থানাধিকারী। ভারতে প্রতি ১০০০ শিশুর মধ্যে ৬৫ জনের মৃত্যু হয়। যেখানে নেপাল এবং বাংলাদেশে প্রতি বছর এই মৃত্যুসংখ্যা গড়ে ৪.৫ শতাংশ হারে কমেছে সেখানে ভারতে গড়ে ২.৯ শতাংশ হারে কমেছে। হিসাব অনুযায়ী, ভারতে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে একজন শিশুর মৃত্যু হয়। পৃথিবীর সমগ্র অপুষ্ট শিশুর এক তৃতীয়াংশ ভারতীয়। দেশে বছরে ৪ লক্ষ

শিশু ২৪ ঘন্টার মধ্যেই মারা যায়।

ভারতে মহিলাদের অবস্থাও খুবই খারাপ। UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAM (UNDP) এর ১৯৯৭-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে ৮৮ শতাংশ সন্তানসম্ভবা মহিলা রক্তাল্পতা এবং অপুষ্টি জনিত রোগে ভোগে। ২০০৮-এ মাতৃদিবসে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে সন্তান জন্মের সময় ৭০ জন প্রসূতির মধ্যে একজনের জীবন বিপন্ন হয়। পাকিস্তানে এই সংখ্যাটা ৭৪ জনে ১ জন। চিত্র-এ ১৩০০তে একজন। মায়েদের বিপদ সংক্রান্ত একটি গবেষণায় দেখা গেছে ৭১টি অনুন্নত দেশের মধ্যে ভারতের নাম ৬৬তে। পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে মহিলাদের উপর সবচেয়ে বেশি অপরাধ হয়। UNICEF এর State of the World's Children ২০০৯ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সি ভারতীয় মহিলার মধ্যে ৪৭ শতাংশরই ১৮ বছরে আগে বিয়ে হয়েছে। গ্রামের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা ৫৬ শতাংশ। বিশ্বে যত অপ্রাপ্তবয়স্ক মহিলার বিয়ে হয় তাদের ৪০ শতাংশ ভারতে হয়। NATIONAL CRIME RECORD BUREAU (NCRB) এর "ভারতে অপরাধ ২০০৭" অনুযায়ী ভারতে প্রতি আধ ঘন্টায় একজন মহিলা ধর্ষিত হন। ২০০৭ সালে ধর্ষণ, পণমৃত্যু, নির্যাতন এর যথাক্রমে ১৯৩৪৮, ৭৬১৮, ৩৬৬১৭টি নথিভুক্ত ঘটনা আছে। ২০০১ এর রিপোর্ট অনুযায়ী কয়েকটি দেশে মেয়েদের বিয়ের বয়সের গড় যেখানে এইরূপ— আমেরিকা ২৬, চিন-ব্রাজিল-ইন্দোনেশিয়ার ২৩, পাকিস্তানে ২১, বাংলাদেশে ১৯ সেখানে ভারতে ১৮.৩। অর্থাৎ স্বাধীনতার ৬২ বছর পরেও ভারতের নারী স্বাধীনতা বিপন্ন এবং তারা চূড়ান্তভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত।

রাজনীতি : যেহেতু স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিচিত এবং যেখানে সামান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল এদেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে আসছে তাই এ ব্যাপারে কিছু তথ্য দেওয়া জরুরি। জুলাই ২০০৮-এর ওয়াশিংটন টাইমস্ এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের ৫৪৪ জন সাংসদ এর মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশের বিরুদ্ধে মানুষ কেনাবেচা, হিসাব বহির্ভূত আয়, ধর্ষণ, এমনকি খুন ইত্যাদি বিভিন্ন ফৌজদারী মামলা আছে। রাজ্যস্তরে এই অবস্থা আরও খারাপ। যেমন, উত্তরপ্রদেশে ২০০২ এর বিধানসভা নির্বাচনে ৪০৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ২০৬ জনের বিরুদ্ধেই ফৌজদারী মামলা আছে। এরকম সাংসদ এবং বিধায়কদের হাতেই আমাদের দেশের সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া আছে। আর যার পরিণাম "বর্তমান ভারত"।

অপরাধমূলক কাজ : অপরাধমূলক কাজ ভারতে বিভিন্ন রূপে ছড়িয়ে আছে। যেমন ড্রাগের কারবার, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখা, তোলাবাজি, টাকার বিনিময়ে খুন, লোক ঠকানো, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, ধর্মীয় জিগির তুলে দাঙ্গা সৃষ্টি ইত্যাদি।

ড্রাগের চোরাকারবারীতে ভারত বিশ্বের অনেক দেশের থেকেই এগিয়ে। নিষিদ্ধ আফিম উৎপাদনে ভারত বিশ্বে প্রথম স্থানাধিকারী। NCR এর ২০০৩-০৪ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে ৪০ লক্ষ মানুষ ড্রাগের নেশা করে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বেআইনি অস্ত্র কারখানায় প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি হয়, যার একেকটি ২৫০ টাকারও কম দামে বিক্রি হয়। (IANSA) এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী সারা বিশ্বে ৭ কোটি যার মধ্যে ভারতে ৪ কোটি বেআইনি ছোট অস্ত্র মজুত আছে। ১৯৫৩ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে অপরাধমূলক কাজের হ্রাসবৃদ্ধি সম্পর্কে NCRB এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ৫৩ বছরের চুরির হার ৩৮ শতাংশ কমলেও খুন, অপহরণ, ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা যথাক্রমে ২৩১ শতাংশ, ৩৫৬ শতাংশ, ১২০ শতাংশ, ১৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৬ এর NCRB এর রিপোর্ট থেকে কিছু তথ্য :— খুন ৩২৪৮১, খুনের চেষ্টা ২৭২৭০, অপহরণ ২৩৯২১, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ৫৬৬৪১টি। ২০০৭ সালে মহিলাদের উপর অপরাধ—যেমন নারী-নির্যাতন, শ্লীলতাহানি, নারীপাচার ইত্যাদির ১,৮৫,৩১২টি নথিভুক্ত ঘটনা আছে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় প্রকৃত সংখ্যাগুলি এর থেকেও অনেক বেশি। NCRB এর ১৯৯৮-র রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১০ সালের মধ্যে ভারতে মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধ বৃদ্ধির হার ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হবে।

মানব উন্নয়ন : রাষ্ট্রপুঞ্জ ২০০৫ এর ৭ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে মানব উন্নয়ন রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্ট প্রতি বছর প্রতিটি দেশের সরকারি সহযোগিতায় তৈরি করা হয়। এই রিপোর্ট থেকে কিছু তথ্য :— রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৭৭টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১২৭ নম্বরে। প্রতিদিন ভারতের ৫ কোটি মানুষ অনাহারে থাকে। পৃথিবীর সর্বাধিক অভুক্ত শিশুর বাস ভারতে। এদেশের শতকরা ৫৮ ভাগ শিশু ভিক্ষা ক'রে, শ্রম বিক্রি ক'রে, দেহ বিক্রি ক'রে বেঁচে আছে। ২০ কোটি শিশু স্কুলে যায় না। ৫০ কোটি মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ নেই। বছরে ৫ লক্ষ কন্যা ভ্রুণ হত্যা করা হয়। ভারতে প্রতি চারজন বালিকার মধ্যে একজন প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়নি। ভারতের শিশুদের তুলনায় বাংলাদেশের শিশুদের মানসিক বিকাশধারা অনেক উন্নত। একজন ভারতীয়র গড় আয়ু আমেরিকানদের তুলনায় ১৪ বছর কম। ২০০৫ -এ ১২৭তম স্থানে থাকাকালীন ভারতের এই অবস্থা ছিল। বর্তমানে ২০০৯ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের অবস্থান ১৩৪তম স্থানে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিস্থিতির অবনতিই হয়েছে। চার বছরে আরও সাতটি দেশ আমাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছে।

ভারতের খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির এই তালিকাটি এখানেই শেষ নয়, এদেশ সম্পর্কিত এবং বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য সম্বলিত রিপোর্ট প্রতি বছর প্রকাশিত হয়ে

আসছে যা আমাদের 'উদার' ও 'নিরপেক্ষ' প্রচার মাধ্যমের দৌলতে আমরা কোনোদিন জানতে পারি না। ভারতের শতকরা ২০ বা ২৫ ভাগ মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে দেশের ৭৫ ভাগ মানুষের দারিদ্র ও বঞ্চনার চিত্র। কারণ বর্তমান ভারতে "শাসক" ও "শোষক" এই দুটি শব্দ প্রায় সমার্থক।

এত কিছু জানার পরও কি আমরা বিশ্বের দরবারে গর্বের সঙ্গে বলতে পারব—

"সারে জাঁহা সে আচ্ছা
হিন্দুস্থান হামারা?"

ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর থেকে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় "Incredible India"। ভারত সম্পর্কে এত কিছু জানার পর মনে হচ্ছে সত্যিই "অবিশ্বাস্য ভারত"! ভারতের তুলনা নেই। আপনি কি বলেন?

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা জাতীয় সীমানা মানে না—ভেঙ্কি

ভেঙ্কটরামন ওরফে 'ভেঙ্কি' রামকৃষ্ণণ এবার রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন আরও দু'জনের সঙ্গে। তাদের একজন আমেরিকান, অন্যজন ইজরায়েলের। ভেঙ্কটরামনের বিষয় ছিল প্রাণীর শরীরের কোষে অবস্থিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাইবোজোম, যা আমাদের বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলো পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত করে, তার গঠন ও কাজকর্ম নিয়ে। তাছাড়া আমরা যে অ্যান্টিবায়োটিক ওযুধ গ্রহণ করি, তাও প্রবাহিত হয় রাইবোজোমের মধ্যে দিয়ে। অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ এই রাইবোজোমের কান্ডকারখানা।

তা আমরা ভারতীয়রা যখন উত্তেজিত তার ভারতীয়ত্ব নিয়ে, অতি পরিচিত দক্ষিণ-ভারতীয় নাম দেখেই গদগদ হয়ে বহু ভারতীয় ই-মেল-এ অভিনন্দনের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন, তখন ভেঙ্কি নিজে কিছুটা বিব্রত। অস্বস্তিতে।

ভারতীয়দের কাছে তার অনুরোধ—বিজ্ঞানে নোবেল পাওয়াটাকে তারা যেন ক্রিকেট খেলার সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলেন।

সত্যিকারের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়ে তিনি বলছেন—বিজ্ঞানের কাজ সত্যের ও জ্ঞানের সন্ধান করা, কোনও দেশের প্রতিনিধিত্ব করা নয়। বিজ্ঞানের কোনো জাতীয় সীমানা হয় না।

ফি চা র

মানবোন্নয়ন সূচক : এক পশ্চাদ গমনের কাহিনি

সুমন দাঁ

UNO-এর সহযোগী সংস্থা UNDP (United Nations Development Programme) প্রকাশ করল ২০০৮ সালের মানবোন্নয়ন সূচক বা Human Development Index (H.D.I.). প্রতি বছর সম্ভাব্য আয়ু, জন প্রতি আভ্যন্তরীণ উৎপাদন, সাক্ষরতার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার, নারী-পুরুষের সাম্য ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে যে সূচক নির্ণয় করা হয় তার মানের সীমা ০ থেকে ১। এই মানের ভিত্তিতেই ক্রমতালিকা প্রকাশ এবং অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ নির্ধারিত হয়। ০ থেকে ·৫, ·৫ থেকে ·৮ এবং ০·৮ থেকে ১ যথাক্রমে অনুন্নত, উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশের মান। বর্তমানে প্রকাশিত সূচকটি ২০০৭ সালের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গঠিত। এখানে মনে রাখতে হবে UNDP-র এই রিপোর্টটি তৈরি হয় সংশ্লিষ্ট দেশের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে।

H.D.I. ও ভারত :

১৯৮০ সালে শুরু হওয়া এই রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের H.D.I. মান ছিল ০·৪২৭, তারপর ১৯৮৫ সালে ০·৪৫৩, ১৯৯০-এ ০·৪৮৯, ১৯৯৫-এ ·৫১১, ২০০০-এ ০·৫৫৬, ২০০৫-এ ০·৫৯৬, ২০০৬-এ ০·৬০৪, ২০০৭-এ ০·৬১২ হয়েছে। অর্থাৎ শেষ সাত বছরে উন্নয়নের হার ১·৩৬ শতাংশ। যা নির্দেশ করে আমাদের মানবোন্নয়ন ক্রমশঃ ঊর্দ্ধমুখী।

এবার উল্টে দেখুন পাল্টে যাওয়ার গল্প।

১৮২টি দেশের মধ্যে সূচক অনুযায়ী প্রথম স্থানে আছে নরওয়ে (H.D.I. = ০·৯৭১)। এরপর পর্যায়ক্রমে অস্ট্রেলিয়া, আইসল্যান্ড, কানাডা, আয়র্ল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও জাপান। এরাই টপ টেন। এছাড়া আমেরিকা ১৩ তম স্থানে আছে।

আর আমার আপনার গর্বের ভারত? সেও আছে। তবে সক্কলকে আগে পাঠিয়ে ১৩৪ নম্বরে। মায় লাতিন আমেরিকার হতদরিদ্র দেশগুলিও দৌড়ে আমাদের কচ্ছপ বানিয়ে ছেড়েছে। এভাবে চললে আর মাত্র ২৫ বছর লাগবে শেষের সেই শ্রেষ্ঠ আসন পেতে।

নুনের ছিটে দিতে দারিদ্র্য সূচক :

মানবোন্নয়ন সূচকের পাশাপাশি রাষ্ট্রপুঞ্জ দ্বারা প্রকাশিত হয় দারিদ্র্য সূচক বা Human Poverty Index. দেখে নেওয়া যাক দুর্দশার আরও আটকাহন—

(১) ১৩৫টি দেশের মধ্যে ভারত ৮৮ তম। খেয়াল রাখার বিষয় দারিদ্র্য সূচকের হিসাবের মধ্যে উন্নত দেশ অনুপস্থিত।

(২) পূর্ণবয়স্কদের ৩৪ শতাংশ নিরক্ষর।

(৩) চল্লিশ বছরের নীচে মৃত্যুর সম্ভাবনা ১৫·৫ শতাংশ।

(৪) ৪৬ শতাংশ শিশুর ওজন (৫ বছর পর্যন্ত) বয়সের তুলনায় কম।

(৫) ৭৫ শতাংশের বেশি মানুষের দৈনিক আয় ২ ডলারের নীচে।

(৬) বিশুদ্ধ পানীয় জল বিহীন অবস্থায় বাঁচা জনসংখ্যার হার ১১ শতাংশ।

(৭) সরকার নির্দেশিত দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ২৮·৬%।

(৮) বয়স ষাট হওয়ার আগেই মৃত্যুহার প্রায় ৩০ শতাংশ ও শিশু মৃত্যুহারে ভারত প্রথম।

রিপোর্টের গুরুত্ব : এক কঠিন বাস্তব :

সূচকটি এতটাই বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবসম্মত যে এর সাহায্যে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ছবি এবং তার সাথে সাথে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। ভারতের সংবিধানের ১২-৩৫ নং ধারায় বিভিন্ন মৌলিক অধিকার বর্ণিত হয়েছে। সূচকটি কম থাকার অর্থ, এদেশে সাধারণ মানুষের বিশেষতঃ দরিদ্র মানুষের বাঁচার, শিক্ষার, স্বাস্থ্যের, সাম্যের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে চলছে সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনও। দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের জোট শিবিরে থেকেও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি যে সাধারণের কাছে পৌঁছাতে পারেনি এই সূচক তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

ধন্দ মেলানোর লক্ষ্যে :

মানবোন্নয়ন সূচক ক্রমশঃ বাড়ছে। অপরদিকে ক্রমতালিকায় ভারত পশ্চাৎমুখী। এ কিভাবে সম্ভব? সম্ভব তখনই যখন অনুন্নত দেশগুলির মানবোন্নয়ন বৃদ্ধির হার ভারতের চেয়ে দ্রুতগামী। উদাহরণ কাছেই আছে। প্রতিবেশী দেশ নেপাল। ১৯৮০ থেকে ২০০৭ অব্দি পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী যে তিনটি দেশের মানবোন্নয়ন সূচক বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে চিন প্রথম, ইরান দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নেপাল। নেপালের মানুষের গড় আয়ু ভারতের জনসাধারণ থেকে বেশি। নেপালের এই স্বপ্নিল উত্থানের পিছনে মাওবাদীদের হাতে গড়া স্বয়ম্ভর গ্রামের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই।

সমাধানের প্রথম ধাপ :

ভারতের পক্ষে পরিসংখ্যানগুলি মারাত্মক ও ভয়াবহ। তাহলে? এর থেকে উত্তরণের রাস্তা কি? উত্তরটা আছে ঐ রিপোর্টেই। UNDP মানবোন্নয়ন সূচক প্রকাশের পাশাপাশি মানবোন্নয়ন বৃদ্ধির জন্য জোর দিয়েছে অভিবাসনের (migration) উপর। মানুষের স্বাধীনতা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের স্বার্থে তুলে নিতে হবে আন্তর্জাতিক সীমানা দিয়ে যাতায়াতের উপর বাধানিষেধ। তথ্যানুযায়ী বিশ্বের প্রায় ৬৭০ কোটি মানুষের মধ্যে ১০০ কোটি মানুষই অভিবাসী (migrant), যাদের প্রায় অর্ধেক মহিলা। UNDP সংস্থাটি দেশের সরকারের প্রতি আবেদন রেখেছে যাতে সীমানা দিয়ে লোক চলাচলের উপর বাধানিষেধ কমানো হয় এবং মানুষের পছন্দের জায়গায় স্বাধীনভাবে বসবাসের জন্য সহযোগীতা করা হয়। বাকিটা নির্ভর করছে সরকারের সদিচ্ছার উপর।

তথ্যসূত্র : দি টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া

কাঠকয়লার রহস্য উদ্‌ঘাটন

পারভেজ খসরু

ডোমকল : কাঠকয়লার রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়ে গেছে বলে দাবি করল ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি। রানিনগরে নুরজাহান বিবি গত পাঁচ দিন ধরে কলা-আপেল বা অন্য ফল খাওয়ার পর কাদাগোলা বা কাঠকয়লা উগরে দিচ্ছিলেন। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর নুরজাহানের বাড়ি যান যুক্তিবাদী সমিতির মুর্শিদাবাদ শাখার সদস্যরা। ওই সমিতির অন্যতম সদস্য সোনা শেখ বলেন, 'আলমগির শেখের স্ত্রী মানসিক রোগী। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এটা করছে।' সাধারণ মানুষকে ভাঁওতা দেওয়ায় রানিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সদস্যরা।

ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির কর্ণধার প্রবীর ঘোষের নির্দেশে রবিবার সংস্থার মুর্শিদাবাদ শাখার সদস্য সোনা শেখ, রাহুল কর্মকার নুরজাহান বিবির বাড়িতে যান। তাঁরা কলা খেতে বললে অস্বীকার ক'রে নুরজাহান জানান জিন-এর নিষেধ আছে। এর পর ঘরে আবার ফিরে এসে খেতে চান। মুখ থেকে বালি বের করেন। রাহুল কর্মকার জানিয়েছেন, নুরজাহান মুখ থেকে যে-সব বস্তু বের করেছেন, তা সবই ঘরে মজুত রাখা আছে। উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য মানসিক হাসপাতালের ঠিকানা দিয়েছি। আমরা চাই কুসংস্কার ভুলে উপযুক্ত চিকিৎসা হোক। না-হলে কিছু দিনের মধ্যে তাবিজ-কবচের ব্যবসা আরম্ভ হবে।

যুক্তিবাদী সমিতির এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান জেসমিন খাতুন। রানিনগর ব্লক হাসপাতালের বিএমওএইচ সব্যসাচী চক্রবর্তী বলেন, যুক্তিবাদী সমিতির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। চিকিৎসার ব্যাপারে সব রকম সহযোগিতা করা হবে।

'একদিন' কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

ফি চা র

পশ্চাতে রেখেছ যারে...

জয়ব্রত পন্ডা

৪ আগস্ট ২০০৯ সংবাদপত্রে দেখলাম পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের আদিবাসী গোপাল তুড়ু তার স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যা করে নিজে আত্মঘাতী হয়েছে। কারণ গত সাতদিনে শস্যের একটি দানাও তার সন্তান এবং স্ত্রীর মুখে তুলে দিতে পারেনি।

বামফ্রন্ট সরকার আইআইটি খড়গপুরকে জঙ্গলমহলের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করতে বলে। আইআইটি খড়গপুরের কমিটি তার রিপোর্টে জঙ্গলমহলের দারিদ্র ও দুর্দশার কথা জানায়। এবং সেই সঙ্গে জঙ্গলমহলের সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ২০০৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের প্রস্তাব দেয় যার আনুমানিক খরচ দেওয়া হয় ৬৭০০ কোটি টাকা। এরপর পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন কমিটির তরফ থেকে জঙ্গলমহলের উন্নতির জন্য ৮২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। এর মধ্যে ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ১৪ কোটি টাকা সরকারিভাবে খরচ করা হয় যার বেশির ভাগটাই বামফ্রন্টের ক্ষমতাধারী নেতাদের পকেটে যায়। যে স্থানের উন্নয়নে আনুমানিক ৬৭০০ কোটি টাকা খরচ হওয়ার কথা সেখানে উন্নয়নের নামে ১৪ কোটি টাকার খরচ দেখানো একটি প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়।

ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ প্রধানমন্ত্রী জঙ্গলমহলে একটি টিম পাঠায়। টিম তার রিপোর্টে জানায় পশ্চিমবঙ্গের ৪০০০ অনুন্নত গ্রামের মধ্যে ১৫০০ অতি দরিদ্র গ্রাম এই জঙ্গলমহলে অবস্থিত। তারা জানায় এখানে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, ন্যূনতম খাদ্য, শৌচাগারের কোনো ব্যবস্থা নেই। ৫৮০০০ আদিবাসী পরিবারকে পাকা বাড়ির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তার একটিও আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। এই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্প ঘোষণা করতে দেখলাম না। পরিবর্তে যা দেখলাম তা হল, ২৯ জুন সরকার ঘোষণা করল দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করতে অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে দেশের দরিদ্র শোষিত বিক্ষুব্ধ জনগণের উপর আরও ব্যাপক দমননীতি ও অত্যাচার চালাতে তারা এই অর্থবর্ষে আগের অর্থবর্ষের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি বাজেট মঞ্জুর করেছে। ২০০৭-০৮-এ যেখানে এর পরিমাণ ছিল ২১৬৩৪ কোটি সেখানে

২০০৮-০৯-এ ২৫৯২৩ কোটি মঞ্জুর করা হল। ২০০৭-০৮-এ শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষার জন্য ১১৭ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়। ২০০৮-০৯-এ তা বাড়িয়ে করা হয় ১৭০ কোটি টাকা। যেখানে দেশের ৪২ শতাংশ মানুষ বেঁচে থাকার ন্যূনতম খাদ্য পায় না, সেখানে একজনের নিরাপত্তার জন্য বছরে ১৭০ কোটি টাকা খরচ কতটা যুক্তিসঙ্গত? সরকার কি তার কৃতকর্মের জন্য এতটাই শঙ্কিত?

২০০৮-এ লোকসভা নির্বাচনে আমরা দেখলাম ৩০৬ জন সাংসদের প্রকাশিত সম্পত্তির পরিমাণ কোটি টাকার বেশি। কিন্তু এর আগের লোকসভা নির্বাচনে কোটিপতি সাংসদের সংখ্যা ছিল এর অর্ধেক। ৫ বছরে সাংসদ, বিধায়করা হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হলেও জঙ্গলের দরিদ্র আদিবাসীরা দরিদ্রতর হয়েছেন।

এ বছরই সরকার আয়কর ছাড়ের নামে বড় বড় ব্যবসায়ীদের ৬৮৯১৪ কোটি টাকা উপহার দেন। তাছাড়া অর্থনৈতিক মন্দার হাত থেকে বাঁচাতে Excise Duty ছাড় দেওয়া হয় যা থেকে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ১২৮০০ কোটি টাকা আয় হয়। দেশের প্রতিরক্ষার নামে ১৪০০০০ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয় যা গত বাজেটের তুলনায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ আমাদের ট্যাক্সের টাকার সবচেয়ে বড় অংশটি খরচ করা হবে দেশের দরিদ্র বিদ্রোহী মানুষকে দমন করার জন্য এবং বাইরের অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দেশকে ভয় দেখিয়ে অনুগত রাখার জন্য। আর পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে ১ কোটি ৩০ লক্ষ আদিবাসীর উন্নয়নে ১৪ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

আমরা দেখলাম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের বিদ্রোহী আদিবাসীদের জন্যও বাজেট মঞ্জুর করালেন। তিনি ঘোষণা করলেন অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে রাজ্যপুলিশের সাথে একযোগে ৪০ হাজার আধাসামরিক বাহিনী, ৭ হাজার কোবরা বাহিনী এবং প্রয়োজনে ততোধিক সেনাবাহিনী প্রতিটি বিদ্রোহী মানুষের কণ্ঠরোধ করবে, দরকারে তাদের মেরেও ফেলবে। এর জন্য সরকার ৭৩০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এই প্রকল্প রূপায়নে ১২ থেকে ৩০ মাস সময় লাগবে এবং এ ব্যাপারে প্রায় সব সরকারি কর্মচারী অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের দেশের জনগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করার, তাদের খুন করার দায়িত্ব পালন করবে। যে জঙ্গলমহলের উন্নয়নে সরকার ১০০ কোটি খরচ করেনি কিন্তু তাদের বিদ্রোহ দমনে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করলে আদিবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই অস্ত্র তুলে নেবে কারণ আত্মরক্ষার অধিকার সকলের আছে।

ফি চা র

‘সোয়াইন ফ্লু’

অভিজিৎ সাধুখাঁ

‘সোয়াইন ফ্লু’ এই নামটি গত কয়েক মাসে আমাদের কাছে খুব চেনা হয়ে উঠেছে। নামটি শুনলে যেন একটা আতঙ্ক গ্রাস করে। এখন আমরা এই রোগটি সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য জেনে নেব।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

‘সোয়াইন ফ্লু’ একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ, যার নাম ইনফ্লুয়েঞ্জা ‘A’ (H_1N_1)। এই রোগটি প্রথম চিহ্নিত হয় মেক্সিকো-তে, এপ্রিল ২০০৯। জুন মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা জানায়, এটি পৃথিবীর প্রায় ১৩৫টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ৪৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভারতে এটি প্রথম দেখা যায় জুলাই ২০০৯। ২০ আগস্ট ২০০৯ পর্যন্ত ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৪৫ জনের এবং আক্রান্তের সংখ্যা ২৪০ জন।

ভাইরাসটি সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য

ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি অর্থোমিক্সো (Orthomyxo) ভাইরাস। সাধারণত তিন প্রকার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দেখা যায়, টাইপ A, B এবং C। টাইপ ‘A’ ভাইরাসটি প্রথম আবিস্কৃত হয় ১৯৩৩ সালে। টাইপ ‘B’ আবিস্কৃত হয় ১৯৪০ সালে এবং টাইপ ‘C’ আবিস্কৃত হয় ১৯৪৯ সালে। সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসটি টাইপ ‘A’ এর মধ্যে পড়ে এবং এটির সাবটাইপ বা স্ট্রেন (Strain) হল H_1N_1। এটি একটি ‘রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড’ (RNA) যুক্ত ভাইরাস, এবং এই ভাইরাসটিতে ৮টি RNA খন্ড থাকে। এই ভাইরাসটির আকার ৮০-১০০ ন্যানো মিটার। এই ভাইরাসটির চারিদিকে দুই ধরনের অ্যান্টিজেনিক স্পিক থাকে, যা হল হিমোগ্লুটিনিন (Hemagglutinin) বা ‘H’ স্পিক এবং নিউরামিনিডেজ্ (Neuraminidase) বা ‘N’ স্পিক।

এই দুই ধরনের অ্যান্টিজেনিক স্পিকের উপর ভিত্তি করে ‘সোয়াইন ফ্লু’ ভাইরাসের নামকরণ হয়েছে ‘ইনফ্লুয়েঞ্জা A (H_1N_1)’। এক একটি ভাইরাসে প্রায় ১০০টি ‘N’ স্পিক এবং প্রায় ৫০০টি ‘H’ স্পিক থাকে। ‘H’ স্পিক এর কাজ হল শরীরের কোষগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলিকে আক্রমণ করা এবং এটি আমাদের লোহিত রক্ত কণিকাকে জমাট বাঁধিয়ে দেয়। এই ‘H’ স্পিক-এর বিরুদ্ধেই আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। ‘N’ স্পিক এর কাজ হল

ভাইরাসটিকে আক্রান্ত কোষ থেকে বার করা। এখন পর্যন্ত পাখি, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের টাইপ 'A' এর প্রায় ১৫ প্রকার 'H' সাবটাইপ ($H_১$-$H_{১৫}$) এবং প্রায় ৯ প্রকার 'N' স্পিক ($N_১$-$N_৯$) আবিস্কৃত হয়েছে।

'সোয়াইন ফ্লু' এর লক্ষণ

এই রোগটির প্রধান লক্ষণ হল জ্বর, সর্দি, গলাব্যথা, হাত পা এর যন্ত্রণা হতে পারে। শ্বাস কষ্ট হতে পারে, বমি ভাব থাকতে পারে। এই রোগটি বায়ুবাহিত রোগ। সাধারণত এই রোগটি হলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না। সময়মত ধরা পড়লে এবং চিকিৎসা হলে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। এই রোগটি হলে সেই সময় যদি সেকেন্ডারি ব্যাক্টিরিয়াল ইনফেক্সান হয় তবে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকতে পারে। স্টাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, স্টাফাইলোকক্সাস নিউমোনি ইত্যাদি ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা ইনফেক্সাম হতে পারে।

চিকিৎসা

সোয়াইন ফ্লু হলে সাধারণত 'ট্যামি ফ্লু' (Tami Flu) নামের একটি ওষুধ দেওয়া হয়। এছাড়া জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়। এবং ব্যাক্টিরিয়াল ইনফেক্সানের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। ভারতে ট্যামি ফ্লু ওষুধটি একমাত্র সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট হসপাতালেই পাওয়া যায়। (Ref : Microbiology, Tortora, Funke, Case, A Text Book of Microbiology, P. Chakraborty)

উড়িষ্যা র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক 'সেরা বিজ্ঞানমনস্ক' ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে কলকাতার যুক্তিবাদীরা

১০-১১ অক্টোবর ২০০৯, উড়িষ্যার রাউরকেলায় বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান করে সাড়া ফেলে দিল ভা.বি.যু.স.। প্রবীর ঘোষ, সুমিত্রা পদ্মনাভন ও বিপ্লব দাসের নেতৃত্বে কলকাতার টিম উড়িষ্যা র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে দু-দিনে মোট আটটি অনুষ্ঠান ও একটি প্রেস কনফারেন্স করেন। সম্পাদক ডি.ডি. পাত্র মহাশয় অসাধারণ দক্ষতায় এই রাজ্যব্যাপী কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। সঙ্গে সবসময় ছিলেন NIT-র প্রফেসর এন. আর. মোহান্তি ও ড: বনমালী কর।

পুরো রিপোর্ট ছবিসহ পাবেন আমাদের ওয়েবসাইট www.srai.org-তে।

বইমেলায় বিস্ফোরণ :

গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি

প্রবীর ঘোষ ও সুমিত্রা

গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে মাও থেকে চে প্রমুখ অনেকেই বই লিখেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনেক তত্ত্বই আজ আর ততটা প্রাসঙ্গিক নয়। গেরিলা যুদ্ধের আধুনিকতম প্রয়োগ দেখা গেছে নেপালে, শ্রীলঙ্কায় ও ভারতের কিছু অঞ্চলে। কী সেই যুদ্ধের প্রয়োগ কৌশল? আধুনিকতম সমস্ত রকমের প্রয়োগ কৌশল নিয়ে এই গ্রন্থ। আছে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা।

'আজাদি'-তে আছে ২০টি ফিচার। মননশীল, বিশ্লেষণধর্মী এই ফিচারে আছে নার্কো টেস্ট, স্বেচ্ছামৃত্যু, নারী স্বাধীনতা, মেয়েদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার রেসিপি থেকে মণিপুর, কাশ্মীর ও ছত্তিশগড়ে বীভৎস মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিত্যকার ঘটনা। দুই মলাট বন্দি বই দু'টিতে পাবেন উত্তরণের দিশা।

যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ **প্রবীর ঘোষ**-এর

মেমারিম্যান থেকে মোবাইলবাবা ১০০৲

মেমারিম্যান বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী স্মৃতিধর এবং বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। একবার শুনেই নাকি মুখস্থ করে ফেলেন ৭০-৮০ হাজার শব্দের ডিকশনারী। সত্যিই কি তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী? নাকি কৌশলে বোকা বানাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে? আমাদের পরীক্ষায় ১৫-২০টি শব্দও মনে রাখতে পারছিলেন না? জানতে চান? রুদ্ধশ্বাস কাহিনি।

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং... ১২৫৲

'প্রসঙ্গ সন্ত্রাস'-এ এনেছেন 'সন্ত্রাস'-এর নানা সংজ্ঞা। কী বলছে উইকিপিডিয়া, রাষ্ট্রসংঘ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ? 'নেপাল' প্রবন্ধে এসেছে মাওবাদীদের সশস্ত্র সংগ্রাম, তাদের গেরিলাযুদ্ধের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগের খুঁটিনাটি। বিশ্লেষণ করেছেন ভারতের নানা জ্বলন্ত সমস্যা।

প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ

"অন্ধতা ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে, অলীক বিশ্বাসের নামে প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সে একা একটি সৈন্যদল।...এই কাজে প্রবীরের প্রাথমিক প্রেরণা এবং মূল্যবান নেতৃত্ব ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।"

— ড. পবিত্র সরকার।

অলৌকিক নয়, লৌকিক

(১ম) ১৬০৲ (২য়) ১২৫৲ (৩য়) ২০০৲ (৪র্থ) ১২৫৲ (৫ম) ১০০৲

মনের নিয়ন্ত্রণ যোগ-মেডিটেশন ১২৫৲

দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ ফোন : 2219-7920
Fax : 2219-2041 e-mail : deyspublishing@hotmail.com

প্রধান সম্পাদক : সুমিত্রা পদ্মনাভন। সম্পাদক : মানসী, সন্তোষ, মৃণাল
ঠিকানা : ৭২/৮, দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭৪, ফোন : (০৩৩) ২৫৫৯-০৪৩৫
• e-mail : prabir_rationalist@hotmail.com •
website : www.prabirghosh.tk, www.thefreethinker.tk,
www.juktibadi.tk
কলকাতা অফিস : ৩৩এ ক্রিক রো, মৌলালী, কলকাতা-১৪ থেকে প্রবীর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
স্টার লাইন : ১৯এইচ/এইচ/১২এ গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে সুমন রায় কর্তৃক মুদ্রিত

আমরা যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং
হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র

হেমন্ত সংখ্যা | নভেম্বর ২০০৯ | দাম : ১৫ টাকা

“আমরা তবে ফুরিয়ে গেলাম?
শুনতে পান গুরুদেব? ও রবীন্দ্রনাথ?
সেদিনের ভিড় নেই...গান নেই...হাত কবে খালি!
রাখী হারিয়ে ফেলে একা হয়ে গিয়েছে বাঙালি...”
—বিভাস রায়চৌধুরী

মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি
ভারতের প্রকৃত অবস্থান
সচেতনতা
মুখ্যসচিবের কাছে...
বেলুড় মঠের অন্দরে
আমাদের ধর্মচিন্তা
নারী নিগ্রহের নানারকম
বুড়ো হওয়া
মানবোন্নয়ন সূচক
সোয়াইন ফ্লু